ঝলমল



ফাল্গুন
১৩৮৭

অলিম্পিক-এর অনুপ্রেরণা

অলিম্পিয়া। গ্রীক দেবতাদের রাজা জীউস-এর মন্দির। দেবাদিদেব জীউস-এর সম্মানার্থে-ই অলিম্পিক উৎসবের সূত্রপাত। ৭৭৬ খৃষ্টপূর্বে।

এই উৎসবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল সমগ্র গ্রীস। তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত। বহিরাক্রমণে বিপর্যস্ত। কিন্তু উৎসবের মাসে সমস্ত দ্বন্দ্ব, সমস্ত সংঘাত স্তব্ধ হয়ে যেত। অলিম্পিয়ার ক্রীড়া প্রাঙ্গণে শত্রু-মিত্রের মিলনভূমি হ'য়ে উঠত। শৌর্য ও বীর্যে ভাস্বর হত।

কিন্তু কালক্রমে অলিম্পিয়ার এই উৎসব একদা পরিত্যক্ত হ'ল।

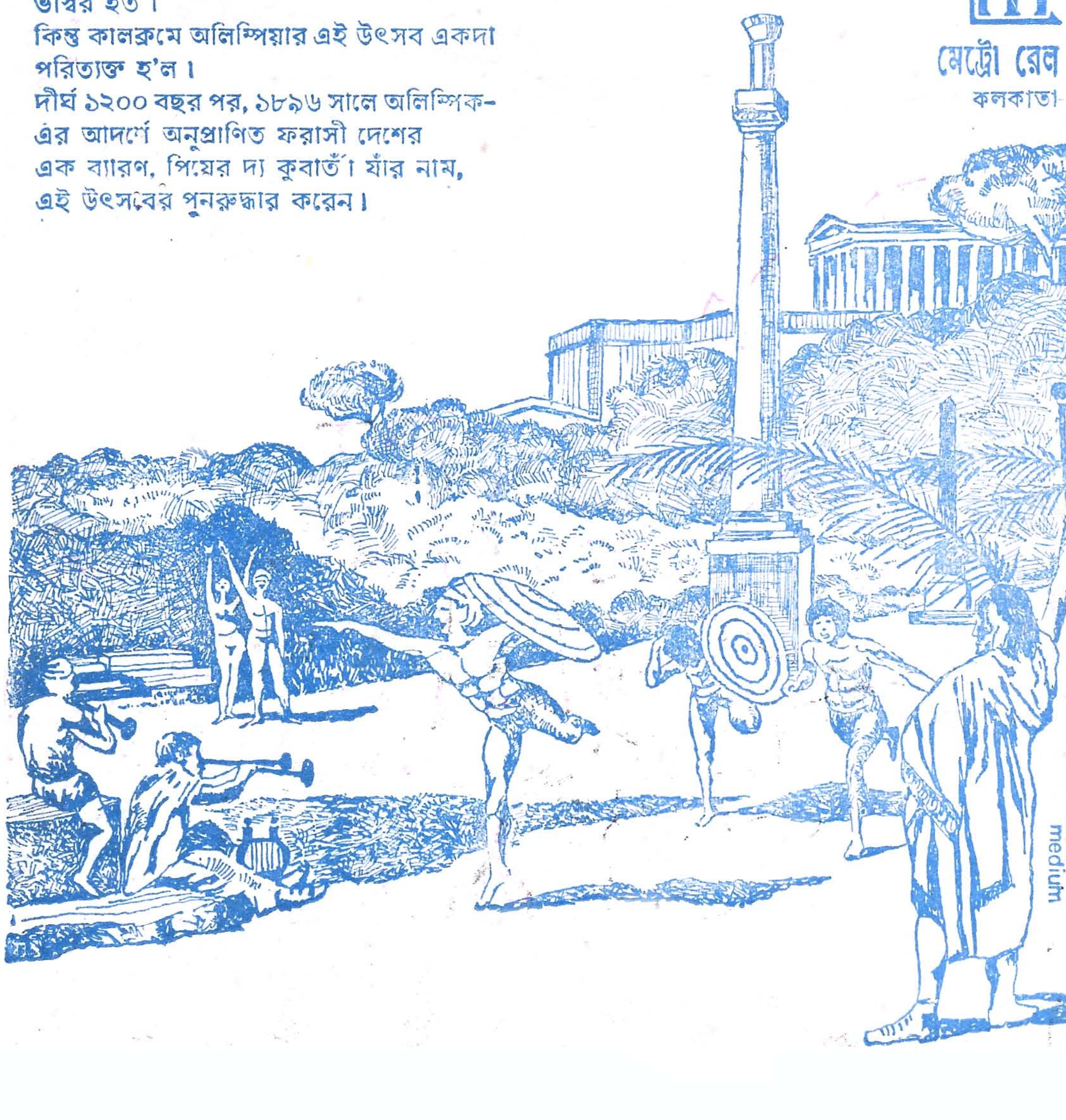
দীর্ঘ ১২০০ বছর পর, ১৮৯৬ সালে অলিম্পিক-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত ফরাসী দেশের এক ব্যারণ, পিয়ের দ্য কুবার্তাঁ যাঁর নাম, এই উৎসবের পুনরুদ্ধার করেন।

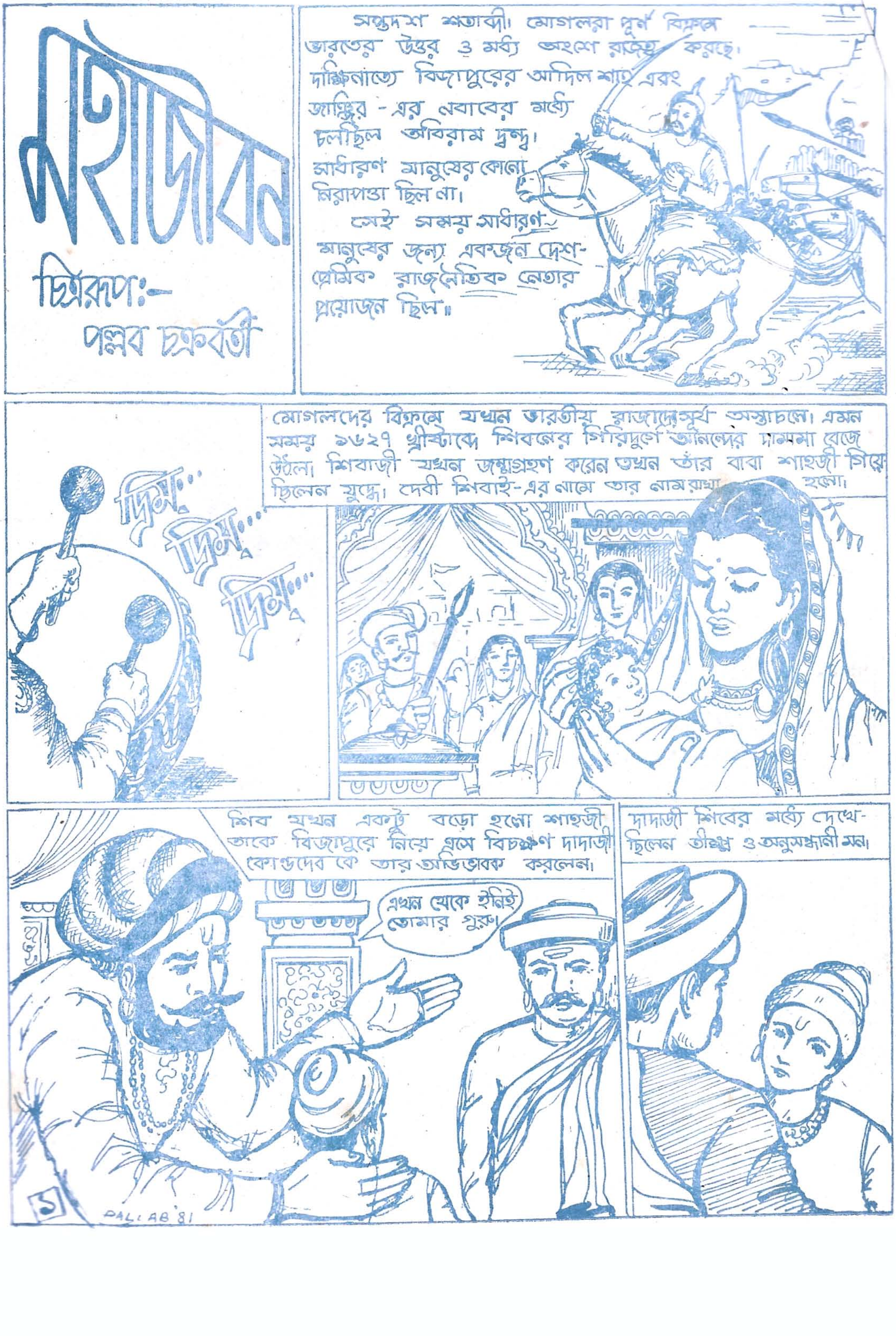
গ্রীস-এর ভৌগলিক সীমারেখা থেকে মুক্ত হয়ে 'অলিম্পিক' সারা বিশ্বের উৎসব হয়ে উঠল।

অলিম্পিক-এর প্রেরণা মৃত্যুহীন। উৎসবের সূত্রপাতে তার উদ্দেশ্য ছিল শক্তি ও সহনশীলতায় গ্রীসকে অনন্য করে তুলতে। এক সংঘাতহীন সৌহার্দের দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে। এই উদ্দেশ্যকে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত করাই বর্তমান অলিম্পিক-এর আদর্শ।

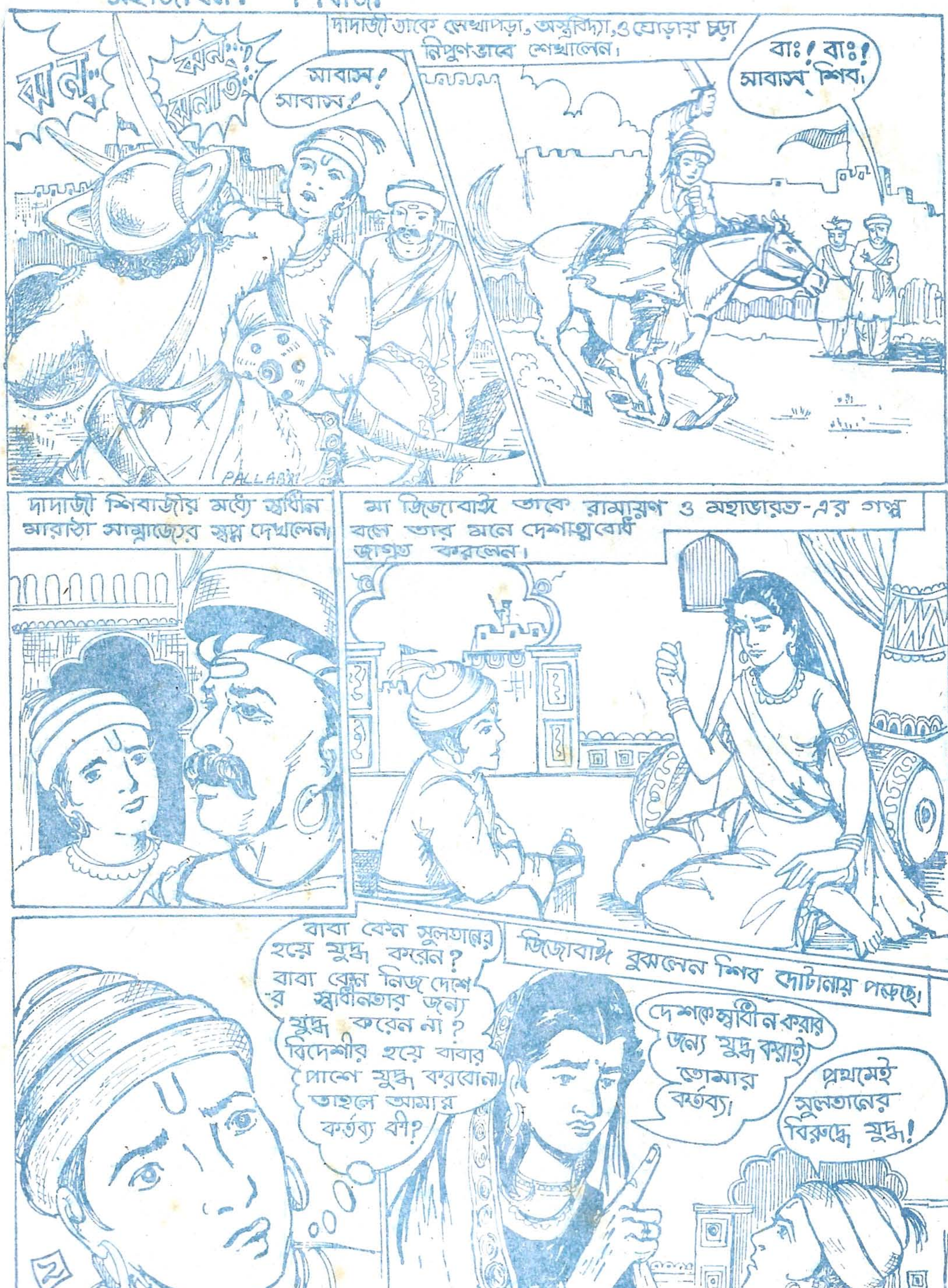
শক্তি, সহনশীলতা ও সৌহার্দের এই প্রেরণায় আমরাও অনুপ্রাণিত।

মেট্রো রেল
কলকাতা




শিবাজীবন
চিত্ররূপ:—
পল্লব চক্রবর্তী
সপ্তদশ শতাব্দী। মোগলরা পূর্ণ বিক্রমে ভারতের উত্তর ও মধ্য অংশে রাজত্ব করছে। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের আদিল শাহ এবং জাঞ্জির-এর নবাবের মধ্যে চলছিল অবিরাম দ্বন্দ্ব। সাধারণ মানুষের কোনো নিরাপত্তা ছিল না।
সেই সময় সাধারণ মানুষের জন্য একজন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতার প্রয়োজন ছিল॥
মোগলদের বিক্রমে যখন ভারতীয় রাজাদের সূর্য অস্তাচলে। এমন সময় ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবনের গিরিদুর্গে আনন্দের দামামা বেজে উঠল। শিবাজী যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর বাবা শাহজী গিয়েছিলেন যুদ্ধে। দেবী শিবাই-এর নামে তার নাম রাখা হলো।
দ্রিম্...
দ্রিম্...
দ্রিম্...
শিব যখন একটু বড়ো হলো শাহজী তাকে বিজাপুরে নিয়ে এসে বিচক্ষণ দাদাজী কোণ্ডদেব কে তার অভিভাবক করলেন।
এখন থেকে ইনিই তোমার গুরু।
দাদাজী শিবের মধ্যে দেখেছিলেন তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধানী মন।
১
PALLAB '81

মহাজীবন :- শিবাজী


ঝন্‌ ঝন্‌ ঝনাৎ
সাবাস! সাবাস!
দাদাজী তাকে লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা, ও ঘোড়ায় চড়া নিপুণভাবে শেখালেন।
বাঃ! বাঃ! সাবাস, শিব।
দাদাজী শিবাজীর মধ্যে স্বাধীন মারাঠা সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখলেন।
মা জিজাবাঈ তাকে রামায়ণ ও মহাভারত-এর গল্প বলে তার মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করলেন।
বাবা কেন সুলতানের হয়ে যুদ্ধ করেন? বাবা কেন নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেন না? বিদেশীর হয়ে বাবার পাশে যুদ্ধ করবোনা। তাহলে আমার কর্তব্য কী?
জিজাবাঈ বুঝলেন শিব দোটানায় পড়ছে।
দেশকে স্বাধীন করার জন্যে যুদ্ধ করাই তোমার কর্তব্য।
প্রথমেই সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ!
২

তুষার মানব (পূর্বপ্রকাশিতের পর) চিত্র ও কাহিনীঃ দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



আহত শরীরে কোন রকমে গুহামুখে এলাম। কোনো পাহারা নেই। সাহস করে এগিয়ে চললাম। বাইরে আসতেই চোখে পড়ল এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! একদল আগন্তুক ইয়েতি আমার উদ্ধারকারী ইয়েতিদের আক্রমণ করেছে!



APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION,
WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE
VIDE, NO. 443/16 (2) T.B.C. (Dated 4th December, 1979)



যুগ্ম-সম্পাদক :

অধ্যক্ষ সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য

আচার্য নলীগোপাল আইচ

ফাল্গুন, ১৩৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মরুজীবন—পল্লব চক্রবর্তী	১
২। তুষার মানব—দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
৩। চালাক—অমৃতলাল পাঁজা	৭
৪। খেয়ালি তানসেন—কিংশুক ভাদুড়ী	৮
৫। গ্রীনল্যাণ্ডে টারজান—ননীগোপাল আইচ	৯
৬। শাপে বর—দেবব্রত দাস	১১
৭। শব্দবরফি—	১৬
৮। যে বিড়াল কাজের নয়—সুপর্ণা পাল	১৬
৯। সূর্যসাধকদের স্মরণ করো—শ্রীরমেশ দাস	১৭
১০। পরীমাসির সঙ্গে—শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯
১১। কুঞ্জধোপার গাধা—নির্মল কর	২২
১২। রহস্যজনক মৃত্যু—সুব্রত দাস	২৪
১৩। দয়ালু কাঠুরে—শ্রীমতী গৌরী দে	২৭
১৪। জার্মানীতে চার সপ্তাহ—অসিতকুমার চৌধুরী	২৯
১৫। খেলাধুলোর প্রশ্ন ও উত্তর —শচীনশংকর	৩৩
১৬। মোহনবাগানের দিল্লী জয়—শচীন কুণ্ডু	৩৩
১৭। ভেঙ্গসরকার এখন অনেক পরিণত—দেবাশিস দত্ত	৩৬
১৮। অস্ট্রেলিয়ায় ভারত—অজয় হোম	৩৭
১৯। কলিকাতায় প্রথম সাঁতার প্রতিযোগিতা—বিশ্বজিৎ দাস ঠাকুর	৩৯
২০। দিগ্বিজয়ী রঘু—উমা সেনগুপ্ত	৪১
২১। ঝলমল—তাপস বণিক	৪২
২২। দুর্গের ধনরত্ন লাভ—অপর্ণা বসু	৪৩
২৩। নতুন পৃথিবী—সুখেন্দু দত্ত	৪৬
২৪। মাণিকদা, ফুংপিয়াও এবং আমরা—শ্রীসুপ্রিয় বাগচী	৪৯

ঝলমলের এজেণ্টগণ

১। রবীন বর্মণ—হাওড়া/কলিকাতা।
২। ইকনমিক বুকস্টল—শিলিগুড়ি।
৩। সরোজ পুস্তকালয়—বাঁকুড়া।
৪। নবাব এম, ডি, আলি—ধানবাদ
৫। সুশীলরঞ্জন গুপ্ত—তিনসুকিয়া।
৬। ডি, কে, চক্রবর্তী—মরিয়ানী।
৭। সরস্বতী বুক ডিপো—নিউ দিল্লী।
৮। এম, এল রায়—মৌভনধর।
৯। বিমলেন্দু রায়—বর্ধমান।
১০। রাজলক্ষী ষ্টোর্স—বিহার।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

১ রাজেন্দ্র দেব রোড (ঠনঠনিয়া কালী বাড়ির সম্মুখে)। কলি—৭০০ ০০৭। ফোন—৩৪-৭৮০৩।

শ্রীস্বপন মল্লিক ও শ্রীসিতাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রগতি প্রিণ্টার্স, ৭৫, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত এবং পি-৪৬, নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কলি-৭০০ ০৫৪ হইতে প্রকাশিত।

ফাল্গুন সংখ্যা : মূল্য—১.৮০ টাকা

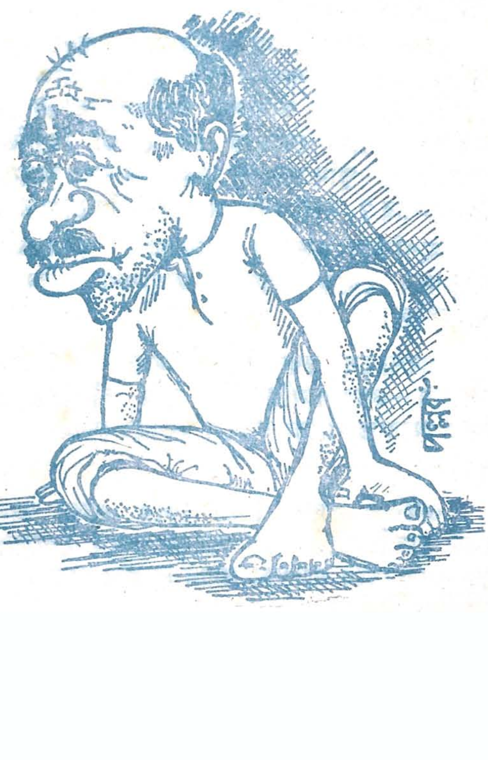


তৃতীয় বর্ষ ফাল্গুন, ১৩৮৭ একাদশ সংখ্যা

চালাক

শ্রীঅমৃতলাল পাঁজা

বনপলাশীর হবু খুড়ো গোবর্ধনের পিসে
দিন রাত্রি ভেবেই মরে চালাক হবে কিসে ?
যদু বলে, খুড়ো এত ভাবছ বসে কি ?
চালাক হওয়ার সূত্রখানা এইত কষেছি।
লিখতে লিখতেই লেখক যে হয় সর্বজনেই কয়,
এক দিনেতে হয়না পাঠক, পড়তে পড়তেই হয়।
অনেকেতে হয় একদিন খেলতে খেলতেই খেলোয়াড়,
এক আধজন হয় এমনি জানতে জানতে জানোয়ার।
এক কাপ নয় আধ কাপ নয়, খাও কাপ চা লাখ
এমনি করেই ধীরে হবে তুমি চালাক।
উপদেশের কথা যেমন, তেমনি খুড়োর কাজ
সবাই দেখে ভাবে, কেন চালাক খুড়ো আজ।



খেয়ালী তানসেন

কিংশুক ভাদুড়ী

ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিখ্যাত গায়ক তানসেনের নাম সবাই জানে। নিজেদের কীর্তিকাহিনী রেখে গিয়ে যাঁরা চির অমর হয়ে রয়েছেন তানসেন তাঁদের মধ্যে একজন। তানসেনের আসল নাম ছিল রামতনু পাঁড়ে। হোসেনি নামে এক মুসলমান রমণীর সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে গিয়ে ইনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন পরে তার নাম হয় মহম্মদ আতা আলী খাঁ। পরে বাদশা আকবর তার গান শুনে তাকে 'তানসেন' পদবী দেন। তানসেন কথার অর্থ হল 'তানের দ্বারা 'সৈন' অর্থাৎ হৃদয় দ্রবীভূত করতে পারেন যিনি।

এই তানসেন ছিলেন বড় খেয়ালী প্রকৃতির। টাকা পয়সার কোনদিন মর্যাদা দিতেন না। নিজের খেয়ালে চলতেন। একবার বাদশা তাঁকে তাঁর গান শুনে একটা আঠেরো লক্ষ টাকা দামের হার উপহার দিয়েছিলেন। খেয়ালী তানসেন সেই হার হঠাৎ একদিন বিক্রি করে দিলেন। বিক্রি করার প্রয়োজনে তিনি করেন নি। সম্পূর্ণটাই খেয়ালের বশে করেছেন। একবারও তিনি ভাবেন নি এই হার বিক্রি করার পরিণাম কি ঘটতে পারে।

কথাটা বাদশার কানে উঠলো। বাদশার দেওয়া উপহার বিক্রি! সামান্য কথা নয়। আকবর রেগে গেলেন ভীষণ। তানসেন দরবারে যেতেই জিজ্ঞেস করলেন আমি তোমায় যে হারটা দিয়েছি সেটা কোথায়? তুমি তো তা একদিনও পরে আসো না। কি ব্যাপার? কাল পরে আসবে আমি দেখতে চাই।

মুশকিলে পড়লেন তানসেন। খানিকক্ষণ মুখ নীচু করে থেকে বললেন—জাঁহাপনা আমি সে হার খুইয়েছি।

বাদশা সে কথা শুনে আরো রেগে গেলেন। বললেন—ওসব শুনছি না। তুমি যদি সে হার না নিয়ে আসতে পারো তাহলে দরবারে তোমার আর ঠাঁই হবে না।

একরাশ লজ্জা নিয়ে ফিরে এলেন তানসেন। সেই সঙ্গে চিন্তা। কি করবেন ভেবে পেলেন না। কে তাকে দেবে বাদশার সমান মূল্যের হার।

চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তা করতে করতে মনে এল রেওয়ার রাজা রাজারামের কথা। প্রথমে তিনি এঁর দরবারেই স্থান পেয়েছিলেন গুণী হিসেবে। তারপর সেখান থেকে দিল্লীর দরবারে।

রাত হতেই তিনি যাত্রা করলেন রেওয়া অভিমুখে। রেওয়ায় পৌঁছে দেখা করলেন রাজারামের সাথে। কুশল বিনিময়ের পর তানসেন রাজাকে বললেন—মহারাজ অনেক দিন আপনাকে আমার কোন গান শোনাতে পারি নি আজ তাই এসেছি কিছু শোনাতে।

মহারাজ রাজারাম তাঁর প্রতি তানসেনের প্রীতি দেখে খুশী হলেন। বললেন—তাহলে শুরু কর।

রাজারামকে শোনাবার জন্য তানসেন দুটি ধ্রুপদ গান তৈরী করে এনেছিলেন। তিনি সেই গান শুরু করলেন গাইতে।

গান এক সময় শেষ হল। মুগ্ধ হলেন রাজারাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজের পা থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দামের খড়ম দুটো খুলে দিলেন তানসেনকে!

উপহার পেয়ে অভিভূত হলেন তানসেন। যাত্রা শুরু করলেন দিল্লীর দিকে।

দরবারে ফিরে আসতেই বাদশা আকবর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন কি তানসেন আমার হার কোথায়?

তানসেন এক মুহূর্ত বাদশার মুখের দিকে চেয়ে কাপড়ের মধ্যে থেকে বার করলেন রাজারামের কাছ থেকে পাওয়া উপহার সেই মহামূল্য খড়ম দুটি। বাদশার সামনে সে দুটোকে নামিয়ে রেখে কুর্নিশ করে বললেন, জাহাপনা আপনার আঠেরো লক্ষ টাকা মূল্যের হারের দাম বাদ দিয়ে বাকীটা ফেরৎ দেবেন।

খড়মের মণিমুক্তোর বর্ণচ্ছটায় সমস্ত দরবার ঝলমল করে উঠেছিল। বাদশা অবাক হয়ে সেদিকে চেয়েছিলেন।

তানসেনের কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে লজ্জিত হলেন ভীষণ। মাথা নীচু করে নেমে এলেন সিংহাসন থেকে। জড়িয়ে ধরলেন তানসেনকে।

তানসেন বললেন—জাঁহাপনা এই রত্নপাদুকা সঙ্গীতের সাতসুরের একটা সুরেরও যোগ্য নয়।

আকবর বললেন—ক্ষমা করো তানসেন, আমি বুঝতে পারি নি আমার হারের মূল্য তোমার সঙ্গীতের মূল্যের কানাকড়িও নয়।

দুজনে অনেকক্ষণ সেই ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ রইলেন।



[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

ননীগোপাল আইচ

[আগেকার কথা ঃ—একটা জাহাজ জাম্বেসী নদীর ধারে নোঙ্গর-করা ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন হেনরী রাত্রে ডেকে বসে চাঁদের আলোয় চারিদিকের শোভা দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি কাগজে-দেখা শুক্রযানের মত একটা কিছুকে নদীর ধারে দূরের বনের মধ্যে নেমে পড়তে দেখলেন। তাঁর মুখ থেকে সেই কথা শুনে শুক্রযানকে দেখবার জন্য জর্জ তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে বনের মধ্যে চলে গেলেন। তাঁরা শুক্রযানকে দেখতে পেলেন না। দু'জন কালো লোক ও একজন ফর্সা লোককে শুক্রযানের লোক ভেবে তাদের জাহাজে নিয়ে এলেন। জাহাজ পরে মাদাগাস্কারের পাশ দিয়ে মরিশাসে গিয়ে পৌঁছল। জাহাজের সকলে অতিথিভবনে উঠলেন। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী শিউ-সাগর রামগুলাম শুনলেন, জাহাজের লোকেরা টারজানকে বন থেকে ধরে নিয়ে এসেছেন। তিনি টারজানকে দেখতে অতিথিভবনে গিয়েছিলেন। তাঁর বাসভবনে যাবার সময় চিড়িয়াখানা থেকে পালানো বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে টারজান আহত হল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। টারজান হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ক্যাপ্টেন হেনরি জাহাজ নিয়ে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে। সেখান থেকে গেলেন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। টারজান ও তার দুই সঙ্গী জাহাজ থেকে পালিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হেনরি জাহাজ নিয়ে চলে গেলেন। পরে এক জাহাজে করে টারজান, কুণ্ডা ও গোমা সালভাডর বিমানবন্দরে পৌঁছল। তারপর তারা বিমানে করে নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ডে পৌঁছল। সেখানে গ্রীনল্যাণ্ডের এক এস্কিমো সর্দারের ছেলেকে টারজানের খুব ভালো লাগল। এক সার্কাসের ম্যানেজার টারজানকে সার্কাস পার্টিতে যোগ দেওয়াবার জন্য খুব চেষ্টা করল। কিন্তু টারজান রাজী হল না। সিরেনসেন টারজানকে গ্রীনল্যাণ্ডে যেতে বলল। শেষ পর্যন্ত টারজান, কুণ্ডা ও গোমা গ্রীন-ল্যাণ্ডে ঘুরে আসতে রাজী হল।]

কদিন তুষারপাত হবার পর আকাশে সূর্য দেখা দিল। তুষারপাত হবার পর আকাশে সূর্য দেখা দিল। তুষারপাত থেমে গেল।

কুণ্ডা ও গোমা টারজানকে নিয়ে শহরে বেড়াতে বেরোল। রোদ উঠলেও বেশ ঠাণ্ডা ছিল। তবে এ রকম ঠাণ্ডা তাদের সহ্য হয়ে গিয়েছিল।

সিরেনসেন বাড়ি ফিরে আসছিল। পথে তার সঙ্গে তাদের দেখা হল। কুণ্ডা জিজ্ঞেস করল, 'পাসপোর্ট' কি হয়েছে?'

সিরেনসেন বলল, 'আরো ৪/৫ দিন দেরি হবে।'

সিরেনসেন টারজানের কোল থেকে এরিককে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল। কুণ্ডা ও গোমা টারজানকে নিয়ে শহরের পার্কের মধ্যে গেল।

কুণ্ডা বলল, 'এত শীত। কিন্তু কী সুন্দর গাছ-পালা জন্মেছে!'

পার্কের মধ্যে মধ্যে দু'চারটে জন্তুকে ছোট ছোট ঘরে রাখা ছিল। সেই সব জন্তুকে দেখে টারজানের আনন্দ আর ধরে না। পার্কের শেষ প্রান্তে ছিল ঘন বনের মতো জায়গা। অনেক গাছ ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে ছিল। এই জায়গাটা টারজানের খুব ভালো লাগল। টারজান একটা বেঞ্চে ধপাস করে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে গোমা টারজানকে বলল, চল এবার বাসায় যাই। সিরেনসেন আমাদের জন্যে অপেক্ষা অপেক্ষা করছে।

টারজান বনের গাছপালার দিকে বার বার তাকাচ্ছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল।'

তারা যখন বাসায় ফিরল তখন সিরেনসেন শোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। এরিক মেঝের উপর বসে আপন মনে খেলা করছিল।

টারজান এরিককে কোলে নিয়ে বাইরে চলে গেল। কুণ্ডা ও গোমা তখন পাশের ঘরে।

বহুক্ষণ কেটে গেল। টারজান ফিরল না। কুণ্ডা ও গোমা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল, সে গেল কোথায়? কেন আসছে না?

সিরেনসেনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে দেখল, কুণ্ডা-গোমা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে একবার দরজার দিকে যাচ্ছে, আবার জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাদের মুখে কোন কথা ছিল না।

সিরেনসেন দুহাত দিয়ে চোখটা রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞাসা করল, তারা অমন ছটফট করছে কেন?

কুণ্ডাই প্রথমে কথা বলল, টারজান এরিককে কোলে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে আমাদের কাউকে কিছু না বলেই। এখনও তো ফিরল না।

সিরেনসেন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, বলল সে কী। চলতো, তার খোঁজ করা যাক।'

গোমা কুণ্ডার কানে কানে বলল, 'টারজানের মাথায় হয়তো কু-মতলব খেলেছে। সে এরিককে নিয়ে পালিয়ে যাবে বলেছিল। তাই গেল না তো!

কুণ্ডা বলল, 'কোথায় আর যাবে! যাবার ক্ষমতা তার কোথায়? হয়তো পার্কের বনের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল?'

কুণ্ডা একটু জোরেই কথা বলেছিল। তার কথা সিরেনসেন শুনতে পেল, বলল, কী সর্বনাশ! এরিককে নিয়ে পালিয়ে গেছে। চল চল, তাড়াতাড়ি যাই। যাতে বেশী দূরে পালিয়ে যেতে না পারে।

তিনজনেই একটুও দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল।

প্রথমেই তারা গেল পার্কে। পার্কের বনে গিয়ে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু টারজানকে দেখতে পেল না।

সিরেনসেন বলল, 'আর দেরি করলে চলবে না! চল, এখনই থানায় গিয়ে খবর দিই।'

পার্ক থেকে বেরিয়ে তারা একটা ট্যাক্সিতে উঠে থানার দিকে চলে গেল!

'ঝলমল'-এর পাঠক-পাঠিকাদের বাড়ীতে যদি 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর সংগ্রহ থাকে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বৎসরের উল্লেখ করে 'ঝলমল' অফিসে জানাতে অনুরোধ করি!



শাপে বর

দেবব্রত দাশ

এক্স রে প্লেটটা হাতে নিয়ে টুবলুর বাবা সুশোভনবাবু যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন তাঁর মুখখানা বর্ষার জলভরা মেঘের মতনই থমথম ক'রছে। গভীর চিন্তামগ্ন চোখের কোলে একরাশ বিষন্নতা। টুবলুর মা উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলেন—কী ব্যাপার গো! রিপোর্টে খারাপ কিছু ধরা পড়েছে না কি?

—হুঁ। যেন স্বগতোক্তি ক'রলেন সুশোভন বাবু। তাঁর কণ্ঠস্বরে হতাশা।

—বড় দেরী হ'য়ে গেছে বুঝলে টুবলর, মা, আর কিছুদিন আগেও যদি ধরা পড়তো রোগটা!

টুবলুর মা মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনরকমে খাটের বাজু ধ'রে সামলে নিলেন দেহের ভারসাম্য। অতিকষ্টে জিজ্ঞেস ক'রলেন ধরা গলায় —রোগটার নাম কী?

—ব্রেন টিউমার, একেবারে লাস্ট স্টেজ।

—তাহলে?—তাহলে কি আমাদের টুবলু—

কথা শেষ করতে পারলেন না টুবলুর মা, উদগত অশ্রু সংবরণ ক'রবার উদ্দেশ্যে আঁচল চাপা দিলেন মুখে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুশোভনবাবু। ব'ললেন—কপাল! বুঝলে টুবলুর মা—সবই আমাদের কপাল। না হ'লে আমাদের একমাত্র ছেলে টুবলুর—

গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল সুশোভনবাবুর। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস ক'রলেন—টুবলু এখন কোথায়?

—শুয়ে আছে ওঘরে। মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছে বেচারী।

সুশোভনবাবু স্ত্রীকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন—এখন একটাই মাত্র পথ আমাদের সামনে খোলা আছে। তা হ'লো ডক্টর পুরন্দর সেনের শরণাপন্ন হওয়া। এদেশে উনিই একমাত্র ডাক্তার, যিনি ব্রেন ট্রানসপ্ল্যানটেশান করেন।

—সেটা আবার কি জিনিস ?

টুবলুর মা'র দু'চোখে আশার আলো চিক্ চিক্ ক'রে উঠলো।

—অন্য কোন মানুষের সুস্থ সবল ব্রেন রোগগ্রস্ত ব্রেনের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া।

—ওসব না ক'রে ওকে একবার ভেলোরে নিয়ে গেলে হ'তো না, ওবাড়ির দিদি বলেছিলেন—অনেক কঠিন কঠিন রোগ—

—না।

মাঝপথে থামিয়ে দিলেন সুশোভনবাবু। বললেন —ডাক্তারবাবুকে কি সেকথা বলতে বাকী রেখেছি আমি। আগে হ'লে হ'তো। ভেলোরে নিয়ে গিয়ে ব্রেন অপারেশন করালেই হয়তো সেরে উঠতো টুবলু। কিন্তু এখন সে চেষ্টা নিষ্ফল।

পার্কস্ট্রীটের এক বহুতল বাড়ির দোতলায় বসেন ডক্টর পুরন্দর সেন। আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট্ না ক'রে তাঁকে রোগী দেখানো যায় না। টুবলুর কেসটা খুব সিরিয়াস বলেই একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করা গেছে।

অনেকক্ষণ ধ'রে খুটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে ডক্টর সেন ব'ললেন—হুঁ, একমাত্র ব্রেন ট্রানসপ্ল্যান্টেশানই এক্ষেত্রে ভাল ক'রে তুলতে পারে আপনার ছেলেকে। তবে খরচ পড়বে প্রচুর।

সুশোভনবাবু ব'লে উঠলেন ও নিয়ে ভাববেন না ডক্টর সেন, সর্বস্ব বিক্রি ক'রে আমার ছেলের চিকিৎসা আমি করাব। একমাত্র ছেলে আমাদের

—তবে মুশকিল কী জানেন ?—ডক্টর সেন ব'ললেন,—এই ব্রেন সংগ্রহ করার ব্যাপারটা ভারী গোলমেলে। মৃত মানুষের দেহ থেকে সময় মতো ব্রেনটিকে অক্ষত তুলে আনা এবং তারপর সেটিকে উপযুক্ত পরিবেশে রক্ষণাবেক্ষণ করা—এক বিরাট সমস্যা।

আমাদের ব্রেনব্যাংকে এই মুহূর্তে কোন ব্রেন নেই, সুশোভনবাবু। হয়তো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে সেজন্যে। অবশ্য কথা দিচ্ছি আপনাকে, যে মুহূর্তে একটা ব্রেনও পাওয়া যাবে সেই মুহূর্তে আপনার ছেলের কেসেই আমি হাত দেব।

সৌভাগ্য ব'লতে হবে টুবলুর, পরদিন সন্ধ্যের আগেই ব্রেন পাওয়া গেল। চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক তরুণ বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হ'য়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সে মারা যায়। খবর পেয়ে ডক্টর সেন ছুটে যান এবং পোস্টমর্টেমের ঝঞ্ঝাট ঝামেলা এড়িয়ে সময়মতো মৃত তরুণের ব্রেনটি তুলে নিয়ে আসেন। টুবলুর বয়সের সঙ্গে তরুণটির বয়সের অবশ্য বেশ পার্থক্য রয়েছে। টুবলুর বয়স বড় জোর বছর চোদ্দ হবে। সাধারণতঃ সমবয়সীর ব্রেনই ব্যবহার ক'রে থাকেন ডক্টর সেন। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু করা সম্ভব নয়, তাই ও নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না তিনি।

একটু পরেই অপারেশান্ থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হ'লো টুবলুকে এবং মাঝরাতের আগেই ডক্টর সেনের কাজ শেষ হ'য়ে গেল।

ভোরের কিছু আগে জ্ঞান ফিরে এলো টুবলুর। বাবা মা যখন দেখতে এলেন টুবলুকে তখন সে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং বড় বড় চোখ মেলে এদিক ওদিক দেখছে কেবল। যেন কিছু খুঁজছে আশেপাশে।

ডক্টর সেন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও কিছু বললেন না ওঁদের। শুধু ব'ললেন—এখন দু' এক দিন টুবলুকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া দরকার। ভয়ের আর কোন কারণ নেই। ট্রানসপ্ল্যানটেশানের কাজ পুরোপুরি সাক্সেসফুল হ'য়েছে। আপনারা এখন ঘন ঘন এলেই ভাল হয়। দিন সাতেকের মধ্যেই আশা করি পেশেণ্টকে আমরা ছেড়ে দিতে পারব।

নার্সিং হোম থেকে আসার সময়ই আপত্তি ক'রেছিল টুবলু। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে একরকম জোর ক'রেই ডক্টর সেন ওকে বাবা মা'র সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু বাড়ি এসেই টুবলু বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রলো। তার প্রথম কথা—আমাকে আপনারা 'টুবলু' বলে ডাকছেন কেন ? ও নামে কেউ তো ডাকতো না আমাকে! আমার নাম শংকর, থাকতুম দমদমে। দেবীনিবাস রোডে কোলাপুসিবল্ গেট-ওয়ালা বিরাট বাড়ি আমাদের। এখানে আপনারা

আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন কেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

সুশোভনবাবু বুদ্ধিমান লোক। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারলেন। টুবলুকে শান্ত ক'রবার উদ্দেশ্যে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—আচ্ছা বাবা বেশ, তোকে না হয় আমরা এখন থেকে 'শংকর' বলেই ডাকবো।

গর্জে উঠলো টুবলু—কিন্তু আপনারা কারা, আগে বলুন তো। আপনাদের আমি চিনি না, জানি না, কোনদিন দেখিও নি। কী সম্পর্ক আপনাদের সঙ্গে আমার?

টুবলুর মা বেচারী এতক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার বলে উঠলেন—এসব কী বলছিস রে তুই টুবলু! আমি তোর মা, সেই একটুকুন থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করলুম তোকে—আমাকে ছাড়া একমুহূর্তও তোর চলত না এতদিন, আর আজ কিনা আমি তোর কেউ না! আমাদের তুই ভুলে গেলি টুবলু?

বলতে বলতে গলা ভারি হয়ে এলো টুবলুর মা'র। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছলেন তিনি।

টুবলু অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারী করছিল। বললো—সেদিন আমি সায়েন্স কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলুম। তারপর……হ্যাঁ, তারপর—মনে পড়েছে—একটা দোতলা বাস তীব্র গতিতে এসে হঠাৎ—উঃ কী ভীষণ যন্ত্রণা—উঃ—চীৎকার ক'রে উঠল টুবলু। উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—তারপর বলুন আপনারা—তারপর কেমন ক'রে আমি এখানে এলুম—আমার শরীরটাও পালটে গেল কিভাবে, এতো ছোটই বা হ'য়ে গেলুম কেমন করে! সবটাই তো আমার কাছে হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। বলুন, চুপ করে থাকবেন না আপনারা—বলুন।

সুশোভনবাবু এর পর মুখ খুলতে বাধ্য হলেন এবং সব শুনে টুবলু ওরফে শংকর চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর, একটাও কথা না বলে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বড় রাস্তায় পড়ে দমদমের বাসে উঠলো টুবলু। যখন দেবীনিবাস রোডের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুলো, তখন দুপুর। কলিং বেল টিপতেই যে দরজা খুলে দিল তাকে চিনতে কোন অসুবিধা হল না টুবলুর। অনেকদিনের পুরনো ঝি—লক্ষ্মীর মা। সে কিন্তু চিনতে পারলো না ওকে। পারবেই বা কেমন করে বলো, টুবলুকে সে তো আর আগে কখনো দেখে নি। সে দেখেছে শংকরকে। টুবলুর শরীরে যে শংকরের ব্রেন যুক্ত হয়েছে, তা সে কেমন করে বুঝবে বলো।

—কাকে চাই খোকা?

লক্ষ্মীর মা দরজার পাল্লা আগলে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলো। টুবলু ওকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল এবং রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। পেছন পেছন লক্ষ্মীর মা ওর মোটা শরীর নিয়ে দৌড়তে লাগলো। থপ্‌থপ্ ক'রে।

—আরে এ খোকা, আচ্ছা জ্বালা তো! বলা নেই কওয়া নেই, গট্ গট্ করে ভেতরে চললে যে, বলি মতলবটা কী তোমার?

গোলমাল শুনে টুবলুর (অর্থাৎ শংকরের) মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। টুবলু ওঁকে দেখতে পেয়ে এক ছুটে কাছে গিয়ে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

—মা—মা গো, আমি ফিরে এসেছি মা। আমি শংকর—তোমার শংকু।……কী—অবাক হ'য়ে যাচ্ছ। চিনতে পারছ না—তাই তো! চিনতে পারবে না জানি, আমার চেহারাটাই তো বদলে গেছে একেবারে। দেখছো না- কত ছোট শরীর হয়ে গেছে আমার!

ভদ্রমহিলা ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। শংকরের নাম শুনে তাঁর সম্বিৎ ফিরে এলো। টুবলুকে ভাল করে দেখতে দেখতে বললেন—তুমি কী বলছো বাবা, আমি তো ছাই মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। শংকু তো এই ক'দিন আগে—

শেষ করতে পারলেন না তিনি, গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে এলো কান্নায়। সন্তানহারা জননী শোকে উদ্বেল হ'য়ে পড়লেন।

টুবলু ওরফে শংকর ওর মাকে আস্তে আস্তে ধ'রে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে দিলো। তারপর একে একে সব ঘটনা খুলে বললো। সব শুনে শংকরের মা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়লেন। লক্ষ্মীর

মাকে বললেন—তোর বাবু আর বড় দাদাবাবুর অফিসে এখখুনি ফোন করে দে। বলু—আমাদের শংকু ফিরে এসেছে, ওরা যেন এখুনি বাড়ি চলে আসে।

টুবলু উঠে ফোনের ঘরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেই মা ওকে টেনে কোলে বসিয়ে দিলেন। বললেন —তুই আমার কাছে বোসে কথা বল বাবা, লক্ষ্মীর মা ফোন করে দেবে ঠিক।

ভদ্রমহিলা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে ভাল ক'রে কথা পর্যন্ত বলতে পারছিলেন না, বুকখানা হাঁপরের মতো ওঠানামা করছিল। টুবলু ব্যস্ত হয়ে বললো—মা তুমি কথা ব'লো না অত, প্রেশারটা বেড়ে যাবে তাহলে!

টুবলুর মা সে কথায় কর্ণপাত না করে বললেন —আচ্ছা বলতো শংকু, তুই আমার হাতের কোনু রান্না সবচেয়ে ভাল খেতিস?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে টুবলু উত্তর দিলো—পার্শে মাছের ঝাল।

টুবলুকে বুকে টেনে নিয়ে ওর মা চুমু দিলেন কপালে, গালে। বললেন—শরীর দিয়ে কী হবে বল, তোকে যে আবার ফিরে পেয়েছি, সেই আমাদের জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যিফল।

লক্ষ্মীর মা ফোন করে এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপার স্যাপার দেখে তার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে সত্যিই ভীষণ গোলমাল বাধলো। শংকরের বাবা অবিশ্বাস করলেন না বটে, তবে মন থেকে পুরোপুরি মেনে নিতেও পারলেন না! বড়দা ভীষণ সাবধানী মানুষ! অনেক রকম আশংকার কথা শোনালেন তিনি। বললেন—ছেলেটাকে রাখতে চাও, রাখ। কিন্তু ওর দিকে চোখ রেখো সব সময়। এর মধ্যে যে কোন মতলব টতলব নেই, তা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যায় না।

মা বললেন—তোর বাপু সব টাতেই কেবল ঘোর প্যাঁচ! ও তাহলে কেমন করে সব কথা বলে দিলো আমায়—শংকু কী খেতে ভালবাসতো, কী জিনিস ব্যবহার করতো, কী নিয়ে রিসার্চ করতো, ওর কে কে বন্ধু ছিল পাড়ায়—সব!

বড়দা বললেন—তাহলে তোমরা যা ভাল বোঝ কর, এর মধ্যে আমি নেই। কিছু ঝামেলা বাধলে আমাকে কিন্তু টানতে পারবে না, এই বলে রাখছি।

টুবলু মুখ ভার করে সোফায় বসেছিল এসব কথাবার্তা পাশের ঘরে হলেও ওর কান ছিল সজাগ! মাঝে মাঝে বড়দার গলাটা খুব উঁচুতে উঠছিল! ফলে, সব বুঝতে পেরে গেল টুবলু, আর তাই মনের দুঃখে —ভীষণ অভিমানে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।

এলোমেলো উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়ালো সন্ধ্যে পর্যন্ত। সকলের ওপর রাগে, দুঃখে, অভিমানে—ওর মনের অবস্থা তখন সাংঘাতিক খিদে তেষ্টার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে। ভাবলো—এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ! নিজের বাড়ীতেই যখন চোর সেজে থাকতে হবে, উঠতে বসতে সবাই ওকে সন্দেহ করবে, তখন শুধু শুধু এই দুর্বিষহ জীবনের ভার আর সে বইবে না।

ভাবতে ভাবতে ওর চোখে জল এসে গেল! মা'র মুখটা মনে ক'রে খুব কান্না পেতে লাগলো। পার্কের বেঞ্চের নির্জন কোণে বসে টুবলু প্রাণ ভ'রে কেঁদে নিল অনেকক্ষণ। তারপর যখন মনটা একটু শান্ত হলো, কোলকাতার বাসায় রাস্তায় রাস্তায় সন্ধ্যের বাতিগুলো জ্বলে উঠতে লাগলো এক এক করে, তখন ও ঠিক করে ফেললো—ডক্টর পুরন্দর সেনের কাছেই যাবে। ওনার হাতে পুনর্জন্ম হয়েছে, ওনার হাতেই পুনর্মৃত্যু প্রার্থনা করবে।

পার্ক স্ট্রীটের চেম্বারে যখন পৌঁছুলো টুবলু ওরফে শংকর, তখন রোগী গিজ্ গিজ্ করছে করিডোরে। দারোয়ান যেই একটু অন্যদিকে গেছে, অমনি টুবলু ভারী দরজার পাল্লাটা ঠেলে সুট্ ক'রে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ডক্টর সেন প্রেসক্রিপশান লিখছিলেন। দরজার শব্দে মুখ তুলে তাকাতেই টুবলুকে দেখতে পেলেন এবং চিনেও ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে।

—আরে কী ব্যাপার, টুবলু না?

—আপনি তো ভাল করেই জানেন ডাক্তারবাবু, দেহটা টুবলুর হলেও আসলে আমি শংকর। আর ঠিক সেই কারণেই বাঁচতে চাই না আমি, আমাকে

আপনি ইঞ্জেকশান দিয়ে বা বিষ ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলুন।

টুবলু খুব জোরের সঙ্গে বললো কথাগুলো।

—কী ব'লছো তুমি টুবলু!

ডক্টর সেনের দীর্ঘ ভুরুযুগল ধনুকের মতো বেঁকে গেল।—এত কষ্ট ক'রে বাঁচালুম তোমাকে, আর এখন কিনা তুমি ব'লছো মেরে ফেলতে! কেন হ'য়েছে কী, ঝগড়াঝাঁটি ক'রে এসেছ বুঝি মা বাবার সঙ্গে?

টুবলু আর সামলাতে পারলো না নিজেকে। ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো ডাক্তারবাবুর সামনেই।

(ডক্টর সেন চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে টুবলুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক কষ্টে শান্ত ক'রলেন ওকে।) তারপর এক এক ক'রে ওর দুঃখের কথাগুলো জেনে নিলেন। গুম্ হ'য়ে কিছুক্ষণ কী ভাবলেন যেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের ভাঁজে আত্মতুষ্টির সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠতে লাগলো। ব'ললেন—শোন টুবলু, মানে ইয়ে—শংকর, তুমি এক কাজ কর। তোমার এখনকার মা বাবার কাছে ফিরে যাও। ওনারা—

টুবলু বাধা দিতে যাচ্ছিল, ডক্টর সেন হাতের ইশারায় চুপ করালেন ওকে। ব'ললেন—যা ব'লছি, মন দিয়ে শোন আগে। ওনারা তোমায় খুবই ভাল বাসেন, মানিয়ে নিয়ে তুমি তোমার নতুন জীবন শুরু কর। আর তোমার আগের মা বাবা? সে কথায় আমি আসছি পরে।

তোমার দেহের বয়েস এখন কত?—চোদ্দ, কিন্তু ব্রেনের বয়েস—পঁচিশ। অর্থাৎ, তোমার বুদ্ধির পরিমাপ দাঁড়ালো কত?—বিরাট একটা মান নিশ্চয়ই। যখন তুমি শংকর ছিলে তোমার আই. কিউ. (Intelligence Quotient) যদি সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির মানুষের মতোই ছিল ধ'রে নেই, অর্থাৎ ১১০ থেকে ১২০-র মধ্যে কোন একটা মান, ধরা যাক—১১৫, তবে এখন সেটা দাঁড়াচ্ছে ১১৫ $\times \frac{25}{14}$, মানে ২০০ র'ও বেশী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের 'আই. কিউ'-ও এত বেশী নয়। মানে, ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পারছ তো? তোমার রিসার্চ যদি তুমি চালিয়ে যাও মন দিয়ে, তবে স্বতঃসিদ্ধের মতন বলা যায়—অদূর ভবিষ্যতে দুর্ধর্ষ সব আবিষ্কার তোমাকে খ্যাতির সিংহাসনে বসাবে। আর তখন তোমার আগের বাবা, বড়দা—এঁরা কি তোমাকে আর অবিশ্বাস ক'রতে পারবেন?

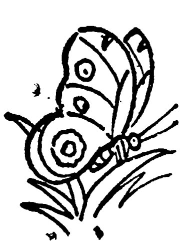
মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব শুনে যাচ্ছিল টুবলু। ডক্টর সেন চুপ ক'রতেই ওর সম্বিৎ ফিরে এলো এবং বিষণ্ণ ক্লান্ত চোখের কোলে খুশির হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

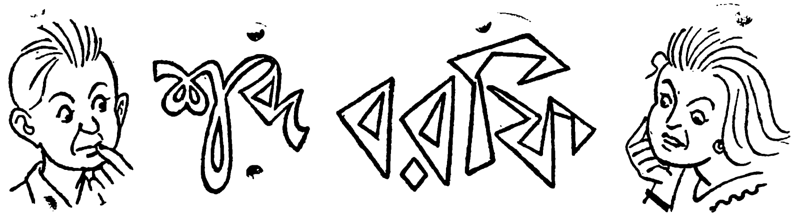
ডক্টর সেন টুবলুর পিঠ চাপড়ে বল'লেন—ওয়েল্ মাই বয়্, এখন থেকে এইসব পাগলামি কিন্তু ছাড়তে হবে তোমাকে। অসুবিধে যদি কিছু হয়, সোজা চ'লে আসবে আমার কাছে দ্বিধা না ক'রে, কেমন।

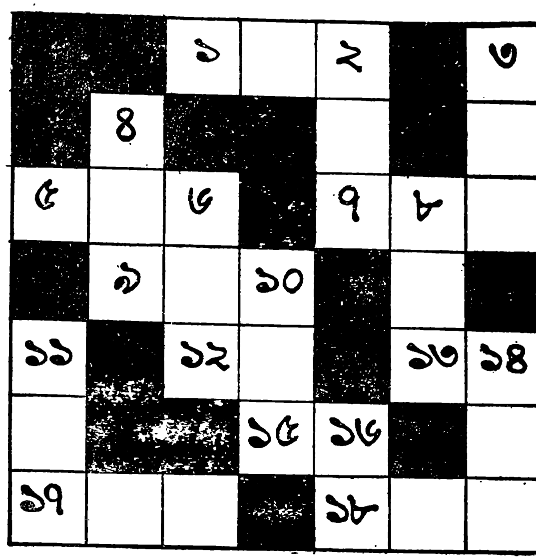
না, কোন অসুবিধেই আর টুবলুর হয় নি। ডক্টর সেনের কাছে অবশ্য সে বারকয়েক গিয়েছিল তার কৃতকার্যতার খবর জানাতে।

তোমরা শুনলে খুশি হবে, মাত্র বছর দশেকের মধ্যেই টুবলু যা যা আবিষ্কার ক'রলো তাতে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান-জগতে তোলপাড় শুরু হ'য়ে গেল।

একটা সুসংবাদ অবশ্য এখুনি আমি তোমাদের দিতে পারছি না, কারণ চূড়ান্ত ফল ঘোষণার এখনও কিছু দেরী আছে। টুবলুর নামটা নোবেল কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য এ বছরই পাঠানো হ'য়েছে এবং আমার বিশ্বাস—রবীন্দ্রনাথ, সি. ভি. রমণ ও হরগোবিন্দ খোরানার পর টুবলুই হ'তে চলেছে ভারতের চতুর্থ নোবেল লরিয়েট্।







পাশাপাশি ঃ—(১) দুহিতা। (৫) ফুলবিশেষ। (৭) খাল। (৯) পাতা! (১২) যশ। (১৩) পদবী বিশেষ। (১৫) ছেদন করা। (১৭) ভূ-স্বর্গ। (১৮) নৃত্য।

উপর নীচ ঃ—(২) এশিয়া মহাদেশের যন্ত্রশিল্পে উন্নত একটি দেশ। (৩) যাতে কিছু থাকে। (৪) যা করবার তা না করা (৬) শজারু (৮) বিভিন্ন (১০) যা না থাকলে রাত্রে ঘর অন্ধকার থাকে। (১১) আগেকার লোকেদের চলাফেরা করার যান (১৪) রং করা (১৬) আকর্ষণ

---

* সমাধান আগামী সংখ্যায় থাকবে। ঝলমল পেয়েই করবার চেষ্টা কর। বেশ মজা পাবে। তাই না?

—শব্দসন্ধানী

যে বিড়াল কাজের নয়

সুপর্ণা পাল

(১১ বৎসর)

ছিল বিড়াল একটা।
মোটা তার লেজটা।
বাঘের মত গোঁফ জোড়া,
সাদা—কালোয় ডোরা ডোরা।
ইঁদুর যদি দ্যাখে,
উল্টো দিকে ব্যাঁকে।

খাবার বেলায় বড় গলা,
কাজের বেলায় কাঁচকলা।
মজা দেখি ব'সে,
ফুলতে থাকি রোষে।



সূর্যসাধকদের স্মরণ করো (তিন)

শ্রীরমেশ দাশ

ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের তৃতীয় পদক্ষেপ শুরু হয় ১৯০৫ সালে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এ ছাড়া জন্মভূমির মুক্তিসাধনায় বলিপ্রদত্ত বিপ্লবীরা ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি সহিংস আন্দোলনের প্রচণ্ড দাপটে কাঁপিয়ে তোলেন।

১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট রাতের ঘন আঁধারে কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোসের ফাঁসি হয়ে গেল বিহারের মজঃফরপুর জেলে। এই মর্মান্তিক ঘটনার শোক ভুলবার অবসর না দিয়ে বর্বর ইংরেজ শাসকগণ এই ঘটনার সূত্র ধরে কানাইলাল, কৃষ্ণগোপাল, কার্বে, বিনায়ক দেশপাণ্ডে প্রভৃতি দেশপ্রেমিক তরুণ বিপ্লবীদের জেলের অভ্যন্তরে ফাঁসীর হুকুম দিয়ে স্বাধীনতাপাগল ভারতের তরুণ সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল সেদিন।

১৯১২ সালে তরুণ বিপ্লবীদের বুকের তাজা রক্তমাখা পিচ্ছিল পথ ধরে নিষ্ঠুর ইংরেজ শাসকগণ চলতে ভয় পেল। তাই তারা সভয়ে বঙ্গভঙ্গ আইন রদ করলো সেদিন। খণ্ডিত বাংলা আবার এক হয়ে গেল।

বিপ্লব আন্দোলনের কাজ এখানেই রইল না থেমে। ১৯১৩ সালে সানফ্রান্সিস্কোতে লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে গঠিত হল 'গদর পার্টি'। এই 'গদর পার্টি'র মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র সৈনিক তৈরী করা এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মি থেকে সৈন্যদের ভাঙিয়ে এনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে ভারতমাতাকে মুক্ত করা।

বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, স্বাধীনতাপাগল ভারতীয় মহান বিপ্লবীরা কেমন করে এই 'গদর পার্টি'র শাখা জার্মানী, জাপান, সাংহাই, হংকং, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশে স্থাপন করে ভারতের বিপ্লবসাধনার কাজ করে চলেছিলেন দ্রুতগতিতে।

১৯১৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের এক স্বর্ণাক্ষরা দিবস। উক্ত ৩০শে সেপ্টেম্বর সুদূর কানাডা দেশ থেকে বিপ্লবীদের সংগৃহীত অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ 'কোমাগাটামারু' কলকাতার সন্নিকটস্থ বজবজে এসে ভিড়লে ঐ জাহাজে স্বাধীনতাসংগ্রামী শিখ বিপ্লবীরা স্বাধীনতার উজ্জ্বল পতাকা দিলেন উড়িয়ে। তাঁরা নিষ্ঠুর ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে করলেন যুদ্ধ ঘোষণা। ইংরেজ সৈনিকদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম হ'ল শুরু। দেশপ্রেমিক মহান-

বিপ্লবী শিখ সেনানীরা সম্মুখ সংগ্রামে বীরের মৃত্যু করলেন বরণ। ইতিহাসের কুটিল আবর্তে এই সব আত্মদানী বীর বিপ্লবীদের আমরা ভুলতে পারি না।

'গদর পার্টি'র স্রষ্টা মহান্ বিপ্লবী নায়ক লালা হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করলো ইংরেজ সরকার। নানা নির্যাতনের পর তাঁকে ইউরোপে নির্বাসনে পাঠানো হ'ল। মাতৃভূমি ভারতের পবিত্র মাটি স্পর্শ করা তাঁর ভাগ্যে আর সম্ভব হল না। শত নিষ্ঠুরতা, শত অবিচার ও অত্যাচারের মাত্রা চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েও ইংরেজ শাসকগণ কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে সক্ষম হল না।

বহির্ভারতে বিপ্লবসাধনায় রত বাবা মোহন সিং মখনা, বাবা নিধান সিং চুগ্গা, জগৎরাম, পণ্ডিত খুশিরাম, বাবা পৃথ্বিসিং আজাদ, পণ্ডিত পরমানন্দ, কর্তার সিং সরোয়া প্রভৃতি 'তেশামারু' জাহাজে করে অতি গোপনে (ছদ্মবেশে) ভারতে ফিরে এসে সশস্ত্র বিপ্লব অভ্যুত্থানের জন্য সাংগঠনিক কাজ করলেন শুরু। সমগ্র ভারতে তরুণ শক্তির বুকে বিপ্লবাগ্নি যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে ঠিক তার প্রাক্‌কালে ধূর্ত ইংরেজ সরকার লাহোর 'ষড়যন্ত্র মামলায়' এদের মধ্যে অনেক তরুণ বিপ্লবীদের ফাঁসীর দড়িতে নিষ্ঠুর ভাবে দিল ঝুলিয়ে। এত করেও ইংরেজ শাসকদের মনের ভয় দূর হল না। তাই বৃটিশ ভারতকে বিপ্লব থেকে দূরে রাখবার জন্য অনেক বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে কালাপানির দেশ সুদূর আন্দামান দ্বীপে নির্বাসনে পাঠাল তারা।

ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানগণ জয়ী হত তা হলে ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ঘটে যেত এক অভিনব রূপান্তর। ঐ রূপান্তরের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে লোকমান্য তিলক, বীর সাভারকর, অরবিন্দ ঘোষ, এম. এন. রায়, লালা হরদয়াল, ম্যাডাম কামা ইত্যাদি মহান্ বিপ্লবীগণ নিশ্চিতরূপে স্বাধীন ভারতীয় সরকার গঠন করতে সক্ষম হতেন।

১৯১৬ সাল। লোকমান্য তিলক ঐতিহাসিক 'হোমরুল লীগ' অর্থাৎ দেশ পরিচালনকারী কর্মী সংঘ স্থাপন করে দাবি তোলেন—'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার'। এই হোমরুল লীগের আদর্শের মূল কথা অ্যানি বেসাণ্ট সমগ্র ভারত ঘুরে ঘুরে প্রচার করে জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুললেন। জাতি যখন স্বাধীনতার মন্ত্রে পাগল হয়ে উঠেছে ঠিক সেই শুভ মুহূর্তে বর্বর ইংরেজ শাসকগণ উঠল ক্ষেপে। তারা জাগ্রত ভারতবাসীকে চরম শিক্ষা দেবার জন্য অলক্ষ্যে প্রস্তুত হতে থাকে।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ পুলিশকর্তা হিংস ভারতবিদ্বেষী জেনারেল ডায়ার গুলির ঘায়ে হাজার হাজার নিরপরাধ বালক-বৃদ্ধ নারী-পুরুষকে হত্যা করল নিষ্ঠুরভাবে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের এই নিষ্ঠুর ঘটনার কথা যখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো তখন ভারতবাসী ঘৃণায় ও ক্ষোভে ফেটে পড়লো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশের দেওয়া নাইট খেতাব এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ ত্যাগ করলেন। জাগ্রত ভারতবাসী ইংরেজ শাসকদের এই বর্বর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রকাশ্য ও গোপন প্রচেষ্টা সমান তালে চালিয়ে যেতে লাগলেন।

বিশ্বকবি গেয়ে উঠলেন—

"তোদের বাঁধন যত শক্ত হবে
মোদের বাঁধন তত টুটবে—।"

পরীমাসির সঙ্গে

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের সুধা মাসিকে বরাবরই দেখতে খুব সুন্দর। ফুটফুটে ফরসা রং, টানা চোখ, একমাথা কালো চুলের রাশ, সব মিলিয়ে যেন ঠিক পরীর মতোই সুন্দরী ; তাই তার ডাক নামও 'পরী'। আমাদের 'পরীমাসি'। চেহারার সঙ্গে এই ডাক নামটা এত মানায় বলেই, ভালো নামটা উচ্চারণ না করে, সকলেই তাকে ডাকতো ঐ 'পরী' নামেই!

সকলের কত প্রিয় ছিল পরীমাসি, তা আমরা ছোটবেলাতেও চোখে দেখেছি। আমরা ছোটরা, সেই বয়েসেই, আমাদের ঐ মাসির জন্যে বেশ গর্ব বোধ করতাম যেন, তাকে অত সুন্দর দেখতে বলে। আর, পরীমাসিও কোন সময় আমাদের বাড়িতে এসে থাকলে, সে সময় তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকতাম আমি। পরীমাসির সঙ্গে আমার সেই বয়েসে জুটিটা মিলেছিল, —কারণ ডানপিটে হিসেবে আমার নাম ছিল পাড়ায় ; আর ঠিক তেমনি, দেখতে অত সুন্দর হলেও, সেই সময় পরীমাসিরও বয়স যা ছিল, তাতে তারও ভিতরে কিন্তু ঐ দুঃসাহসিক কাজ বা বেপরোয়া মাতামাতি, হৈ-হৈ করার নেশাটা কম ছিল না!

সেই বয়েসেই, একবার বেশ বিপদ হয়েছিল পরীমাসির। এক দুষ্ট-আত্মা এসে ভর করেছিল তার সেই সুন্দর শরীরে! ব্যাপারটা আমার নিজের চোখেই দেখা। আর, যখন তা ঘটে, সে সময়ে তো বরাবরের মতোই আমিই সঙ্গী ছিলাম পরীমাসির।

পরীমাসির বয়স তখন বড় জোর সতেরো কি আঠারো। অন্যান্য বারের মতোই সেবারেও গরমের ছুটিতে আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে মাসি, বিপুল মামার সঙ্গে। আমাদের আর আনন্দ ধরে না। ভাই-বোনদের মধ্যে আমি সেবারেও তেমনি ঠিক টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি মাসির সঙ্গে এদিক সেদিক। বাড়ির বাগানের ফল-পাকড় যখন যা খুশী পেড়ে খাওয়া হচ্ছে ইচ্ছেমতো।

গাছ-পাকা আম বড্ড বেশী প্রিয় ছিল পরীমাসির। আর, আমাদের বাগানের গাছে আমের অভাব নেই মোটেই ; তাই ঐ সময় সকাল, দুপুর বহু সময়েই সেই সব বড় বড় আম গাছের নিচেই কেটে যেতো। পাকা আমগুলো বড় একটা রেহাইও পেতো না আমাদের হাতে।

সেবারে গরমের ছুটির দিনগুলো বেশ ভালোই কাটছিল ; হঠাৎই ঘটলো ঐ অঘটনটা! একদিন বিকেলের দিকে ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেললো। ঝড় উঠলো খুব। আর, সেই ঝড়-বৃষ্টি চললো অনেকক্ষণ, প্রায় সন্ধ্যের মুখ পর্যন্ত।

সন্ধ্যের অন্ধকার তখন প্রায় নামি-নামি করছে! সেই সময় ঝড়-বৃষ্টি থামতেই, অমনি পরীমাসি এসে চুপি চুপি আমায় বললে,—'আজ দুপুরে তো বেরুনো হয় নি ; এই বিকেলের ঝড়ে বাগানে নিশ্চয় অনেক পাকা আম পড়েছে, চ'লু গিয়ে কুড়িয়ে আনি!'

পরীমাসির ডাকে সব সময়েই তৈরী আমি। একবারের বেশী আর বলতে হলো না। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সকলের চোখ এড়িয়ে, পিছন দিকের খিড়কির দরজা দিয়ে বাগানের পথ ধরলাম আমরা। সামনে আমি, আমার পিছন পিছন চলেছে পরীমাসি।

বাগানে পৌঁছে পরীমাসি বললে,—'তুই ওদিকটায় এগিয়ে গিয়ে আমগুলো কুড়ো, আর আমি এদিকের গুলো কুড়োই বরং ; তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে!' সন্ধ্যের মুখে, এসময় নিজে এর আগে কখনো পা রাখি নি বাগানে ; তাই আম কুড়োতে একা একটু এগিয়ে যেতেই সারা গা কেমন ছমছম্ করতে লাগল নির্জনে, আবছা অন্ধকারে। কিন্তু, পাছে আমাকে ভীতু বলে রাগায় পরীমাসি, তাই ভয়টা চেপেই, কোন রকমে আম কুড়োতে লাগলাম।

একটু পরেই, জামার কোঁচড়ে কতকগুলো আম কুড়িয়ে নিয়ে, ফিরে এসে দেখি, ওদিকে পরীমাসি

পুকুরপাড়ের বড় আমগাছটার নিচে আম কুড়োচ্ছে। বিকেলে নিশ্চয়ই চুল বাঁধে নি পরীমাসি ; তাই, নিচু হয়ে আম কুড়োবার সময়ে একরাশ এলো-চুল তার সারা পিঠময় ছড়িয়ে রয়েছে তখন।

আবছা সেই অন্ধকারে, পরীমাসির এলোচুলের দিকে নজর পড়তেই, সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে বেজে উঠলো মায়ের মুখের সেই কথাগুলো, যেগুলো কখনো কখনো পরীমাসিকেই লক্ষ্য করে মাকে বলতে শুনেছি, —'এলোচুলে সন্ধ্যেবেলায় এদিক সেদিক কিন্তু ঘুরিস নে পরী। ওতে অনেক সময় খারাপ হয় খুব।'

কথাটা মনে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও চেঁচিয়ে ডাক দিলাম,—'তাড়াতাড়ি ফিরে চলো পরীমাসি, মা খোঁজ করছে নিশ্চয়ই।' কিন্তু, আমার মুখে কথাটা শোনা মাত্রই, খানিকটা দূরে, সেই গাছতলায় দাঁড়িয়েই কেমন অদ্ভুত শব্দ করে সজোরে হাসতে লাগলো পরী-মাসি। ঠিক ঐরকম শব্দ-তোলা হাসি তার আগে কখনোই হাসতে শুনি নি পরীমাসিকে।

নির্জন সেই বাগানে, পরী মাসি এর পর আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে, তার চোখমুখের ভাব লক্ষ্য করে সত্যিই আর এক দফা ভয় পেলাম নিজে। যে পরীমাসি অত সুন্দরী, যাকে আমি অতদিন ধরে চিনি, তার দুচোখের চাউনি তখন পাল্টে যেন সম্পূর্ণ অন্যরকমের হয়ে গেছে, অত ভয়ঙ্কর কুটিল সেই চাউনি!

হঠাৎ এগিয়ে এসেই পরীমাসি নিজের হাতে আমার ডান হাতটা চেপে ধরলো। ধরেই, সম্পূর্ণ অচেনা রকমের গম্ভীর একটা গলার স্বরে বলে উঠলো চ'ল। যাব কী। হাতটা ধরার সঙ্গে সঙ্গে চমকে যেন প্রায় ক'কিয়েই উঠলাম আমি যন্ত্রণায়। কী ভীষণ জোর সেই হাতে! শরীরে কী এতই শক্তি থাকার কথা পরীমাসির! হাতটাকে ভালো করে মুঠো করে ধরে টানতেই, সঙ্গে সঙ্গে মালুম হলো আমার, বুঝি ভেঙ্গে যাবে এক্ষুনি!

বেশ বিপদ বুঝেই, একটুও দেরী না করে, এক ঝটকায় হাতটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রায় দৌড় লাগালাম বাড়ির খিড়কির দিকে। আর, পিছন না ফিরেই, সেই আধা-দৌড়ের মাঝখানে কানে এলো আবার সেই



নিজের হাতে আমার ডান হাতটা চেপে ধরল

বিচ্ছিরি হাসির শব্দটা। তেমনি শব্দ করে হাসতে হাসতেই খিড়কির দিকে আসছে পরীমাসি!

বাড়িতে ঢোকামাত্রই মা খুব ধমক দিলেন দুজনকেই, অন্ধকারে বাগানে গেছলাম বলে। সাপ-খোপের কামড়েই না মরি কোনদিন এইভাবে গাছ-গাছালির নিচে! মা গজগজ করে বার বার বললেন। আমরা কিন্তু মুখে তালা দিয়ে রইলাম চুপ করে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, এলোচুলে থাকার জন্য মা খুব আরেক দফা বকলেও, অত বলাতেও কিন্তু সে রাতে মোটেও সেই এলোচুল বাঁধলো না পরীমাসি! কথা অগ্রাহ্য করে, চুল খুলেই রাখলো।

পরদিন সকালেই আরেক কাণ্ড। বাবা সবেমাত্র বাজার থেকে ফিরে রান্নাঘরের দাওয়ায় বাজারের থলে দুটো নামিয়েছেন, অমনি কোথা থেকে হঠাৎ ছুটে এসেই পরীমাসি মাছের থলেটায় হাত ঢুকিয়ে, সেদিনের বাজার থেকে কিনে আনা টাটকা গোটা ইলিশটাকে দু হাতে তুলে ধরে একেবারে মুখের কাছাকাছি এনে, মাছটার গায়ে নাক ঠেকিয়ে তার গন্ধ শুঁকতে লাগল. আর যেন প্রায় মুখও ঠেকাতে লাগলো তাতে!

—কী করছিস, কী করছিস! বলে, মা ছুটে এসে

সেই গোটা ইলিশটাকে যেন ছাড়িয়ে নিতে পারে না মোটে, পরীমাসির হাত থেকে! অথচ, আমরা সকলেই জানি, পরীমাসি নিজে কোনদিন মাছ-এর খুব একটা ভক্ত নয়। কাজেই, সকাল বেলায় এই অস্বাভাবিক কাণ্ডটা, আর সেই সঙ্গে পরীমাসির পাল্টে যাওয়া চোখমুখের চেহারা লক্ষ্য করে, বাবাকে সঙ্গে সঙ্গে আড়ালে একবার ডেকে নিয়ে, কিছুক্ষণ ধরে কী সব বুঝিয়ে, কোথায় পাঠালেন। আসলে, গতকাল সন্ধ্যের পর থেকেই, পরীমাসির মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করে, কিছুটা আন্দাজ করেছিলেন মা!

আধঘণ্টা পরে বাবা ফিরলেন, সঙ্গে এনেছেন গ্রামের নামী ওঝা রতনলালকে। রতন আসতেই, মা তাকে আলাদা ডেকে কিছু বলে দিলেন আগে। রতনলাল তার সঙ্গে আনা ছোট্ট হাতপুঁটুলিটা উঠোনের মাঝখানে নামিয়ে উবু হয়ে বসলো। আর, রান্নাঘর থেকে মুঠো কয়েক সরষে একটা বাটিতে করে এনে মা রতনলালের সামনে নামিয়ে রাখলো, আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

এরপর মা, বাবা এবং বিপুল মামা মিলে পরীমাসিকে উঠোনে নিয়ে আসতে গেল। কিন্তু পরীমাসি কিছুতেই আসবে না। রতনকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেই সে তখন একেবারে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে রইতে চেষ্টা করছিল। আর, দেখলাম, সতেরো আঠারো বছরের পরীমাসিকে বাবা আর বিপুল মামা কিছুতেই টেনে আনতে পারছে না বাইরে, শরীরের শক্তি দিয়েও। অনেক চেষ্টায় প্রায় হিঁচড়ে আনার মতো অবস্থায়, উঠোনে পেঁছালো পরীমাসি। আর এসেই রতনলালের দিকে একবার আর সামনে রাখা বাটিতে সেই সরষেগুলোর দিকে বড় বড় চোখ করে দেখতে লাগল আর দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল কেবল। পরীমাসিকে দেখে আমি যেন চিনতেই পারছিলাম না সে সময়।

পরীমাসি সামনে আসতে, রতন একমুঠো সরষে তুলে, মাসির দিকে চেয়ে বললো,—'কোন্ জায়গায় ছিলি তুই? কখন ধরেছিস একে? তাড়াতাড়ি বল!'

সঙ্গে সঙ্গে পরীমাসী বলে কেমন নিজেই বলতে লাগলো,—'আমবাগানে, কাল সন্ধ্যেবেলায়!'

—'ধরলি কেন?' রতন বলতেই, আবার পরীমাসিরই মুখ ফুটলো।

—'এলোচুলে সুন্দরী বাগানে গেছলো কেন তখন, তাই সুযোগ পেয়ে নেমে এলাম!' পরীমাসি নিজে নিজেই সব বলে যাচ্ছে রতনের কথার উত্তরে।

—'ছেড়ে যাবি কী না ব'ল এখন!' বলে রতন হঠাৎ এবারে হাতের একমুঠো সরষে পরীমাসির গায়ে ছুঁড়ে দেওয়ামাত্র, যেন প্রচণ্ড জ্বালায় বা যন্ত্রণায় উঃ, আঃ করে শব্দ করতে করতে ছটফট করতে লাগলো মাসি।

ছেড়ে যাবার কথা স্বীকার না করায় রতন উঠে এগিয়ে গিয়ে, আবার একমুঠো সরষে তুলে জিজ্ঞেস করলো, 'বল্ যাবি কিনা ছেড়ে!' সে কথার উত্তর হলো না। হঠাৎ, পরীমাসির হাতের একখানা প্রচণ্ড জোরালো চড় এসে পড়ল রতন ওঝার গালে, নাগালের মধ্যে থাকায়।

আমরা দাঁড়িয়ে দেখে বুঝলাম, সেই চড়টার জোর কত হতে পারে। একটা চড়েই চরখির মতো একটা গোটা পাক খেয়ে উঠোনের সরষের বাটির পাশে প্রায় চিৎ হয়ে পড়েছে রতন। মুঠো খুলে সরষেগুলো উঠোনে গড়িয়ে গেছে ততক্ষণে।

এবারে উঠেই, গালে একবার হাত বুলিয়ে রতন বললো—'বহুৎ তেজী জিন্ ভর করেছে দেখছি! আচ্ছা দাঁড়া, মজা দেখাই তবে!' বলেই, বাটিতে হাত ডুবিয়ে পরপর তিন চারমুঠো সরষে ছুঁড়ে মারতেই পরীমাসি সারা উঠোনময় প্রচণ্ড যন্ত্রণায় দাপিয়ে ছটফট করতে লাগলো আবার। শেষে সরষেরই জিত হল। পরীমাসির মুখ থেকে বেরুলো,—'আর সরষে মারবি না, চলে যাচ্ছি দাঁড়া।'

—'যাবার সময় চিহ্ন রেখে যাবি!' রতন বলে উঠলো। আর তার কথা শেষ হওয়ামাত্র পরীমাসির অত সুন্দর শরীরটা সজোরে আছড়ে পড়ল নিকানো উঠোনে। সকলের চোখের সামনেই। বড় কাহিল দেখাচ্ছিল তখন তাকে। সেদিকে তাকিয়ে ভীষণ কষ্টে যেন বুক ফাটছিল আমার।

যাবার সময়ে চিহ্ন রেখে যেতে বলায়; সেই দুষ্ট আত্মা পরীমাসিকে ছেড়ে যাবার সময় সত্যিই ভেঙে রেখে গেছিলো একখানা মোটা গাছের ডাল, পুকুরপাড়ের সেই আমগাছটার, যার নীচে গত সন্ধ্যেয় ঝড়ের পর এলো-চুলে আম কুড়িয়েছিল পরীমাসি।

কিন্তু, ছেড়ে যাবার খানিকটা আগে, পরীমাসির হাতের যে প্রচণ্ড জোরালো চড়টা পড়েছিল রতনের গালে, সেই চড়ের চিহ্নটা, অর্থাৎ পাঁচ আঙুলের দাগগুলো গালে পুরোপুরি মিলিয়ে যেতে সময় নিয়েছিল কমপক্ষে পুরো একটা দিন।

কুঞ্জ ধোপার গাধা

নির্মল কর



ছাতাওয়ালা গলির কুঞ্জ ধোপার ছোট্ট সংসার। সংসার বলতে ওর বউ আর একটা গাধা। ছেলেপুলে নেই বলে কুঞ্জর খুব দুঃখ। ওর গাধাটা যখন ছোট্টটি ছিল, তখন থেকেই আদরে আহ্লাদে তাকে ঠিক ছেলের মতন মানুষ করে আসছে। এখন বড় হয়েছে, তাই কাজে-কর্মে কুঞ্জর প্রতিদিনের সঙ্গী সে।

গাধার পিঠে কাপড়ের গাঁটরি চাপিয়ে কুঞ্জ যখন রোজ বিকেলে পাড়ার রতন মাস্টারের কোচিং ক্লাশের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, তখন তার মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে যায়। ফেরার পথে এক-একদিন জানালা দিয়ে কচিকাচি সুন্দর ছেলেমেয়েদের দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে। কখনো বা তাদের কথাবার্তা শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে আর ভাবে: 'আমার যদি অমন একটি ছেলে থাকত···অমন একটি মেয়ে থাকতো!' কিন্তু ভাবাই সার। কুঞ্জর সে সাধ পূরণ হয় না! তার দিন কাটে দুঃখে। গাধার প্রতি আদর-ভালবাসাও বেড়ে যায় দিন দিন।

রোজকার মতো সেদিনও ময়লা কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে বাড়ী ফিরছিল কুঞ্জ। কোচিং-এর কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কারণ, রতন মাস্টার রেগে গিয়ে একটি ছেলেকে খুব বকছিলেন, 'তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না গাধা কোথাকার! আরে, গাধা পিটিয়ে মানুষ করা যায়, কিন্তু তুই কোন্ দেশী গাধা রে?'

একথা শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল কুঞ্জ। সারারাত ছট্‌ফট্ ক'রে কাটলো তার। ভাবলো আকাশ পাতাল কতো কিছুই। কিন্তু সে সব জানতে দিল না বৌ-কে। খুব সকালে, ছেলেমেয়েরা পড়তে আসার আগেই সে কোচিং-এ গিয়ে রতন মাস্টারকে ধরলো। সবিনয়ে বললো, 'আমার কোন ছেলেপুলে নেই মাস্টার মশাই। গাধাটাই সব। কিন্তু তাকে দিয়ে তো আর সন্তানের অভাব পূরণ হয় না। আজ্ঞে, আপনি তো শুনলাম গাধাকে মানুষ করতে পারেন। দয়া করে আমার গাধাকে মানুষ বানিয়ে দিন।'

বিরক্ত হ'লেও রতন মাস্টারের হাসি পেয়ে গেল। তিনি অনেক ক'রে বোঝালেন কুঞ্জকে যে, গাধাকে কখনো মানুষ করা যায় না। ওটা আসলে একটা কথার কথা। বোকা ও অবাধ্য ছেলেদের ওরকম বলতে হয়। কিন্তু সেকথা বিশ্বাস হ'ল না কুঞ্জ ধোপার। সে জেদ ধরে বসলো, তার গাধাকে মানুষ না বানিয়ে নিয়ে সে যাবে না।

এমন এক আহাম্মকের পাল্লায় পড়ে রতন মাস্টারের

হ'ল মহা ফ্যাসাদ! তিনি কী আর করেন? শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে কুঞ্জকে বললেন, 'ঠিক আছে, আমার বাড়ির পিছনের বাগানে তোমার গাধাকে ছেড়ে দিয়ে যাও! কিছুদিন পর এসে খোঁজ নিও।'

দুশ্চিন্তায় কিছুদিন কেটে যাবার পর কুঞ্জ ধোপা একদিন সাত সকালে তার মানুষ হওয়া গাধাকে নিতে এল। রতন মাষ্টার বললেন, 'শোন হে, তোমার গাধকে মানুষের মতো মানুষ বানিয়েছি। শুধু তাই নয়, সে এখন ভরতপুরের রাজা। গিয়ে দেখা করে এসো।'

খুশি হ'লেও কুঞ্জ ভয়ে-ভয়ে বলল, 'একেবারে রাজা! রাজা নিয়ে আমার কি হবে?'

রতন মাষ্টার বেশ গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, 'কি আবার হবে, সুখে থাকবে! লোকের বাড়ি-বাড়ি ময়লা কাপড় খুঁজে বেড়াতে হবে না আর!'

আনন্দে এবং উত্তেজনায় কুঞ্জ বললো, 'কিন্তু সে কি আমায় চিনতে পারবে? যদি কথা না বলে? যদি ভাগিয়ে দেয়? রাজা ব'লে কথা!'

রতন মাষ্টার হেসে বললেন, 'চিনতে ও পারবে, কথাও বলবে; গিয়ে দেখই না! যাবার সময় ওর পছন্দসই খাবার যা' যা' আছে নিয়ে যেও। অ্যাদ্দিন পর দেখা করতে যাচ্ছ তো, খুশিই হবে।'

কুঞ্জর গাধার প্রিয় খাদ্য খইলে মাখা যব। ঝাড়াই-করা তারই এক বস্তা নিয়ে কুঞ্জ চললো ভরতপুরের উদ্দেশ্যে। খুব হাসিখুশি মনে গান গাইতে গাইতে কখন এক সময় ভরতপুরের রাজপ্রাসাদের সামনে এসে হাজির হল সে। কিন্তু পরনে ময়লা জামা-কাপড় দেখে প্রহরীরা ফটকের মুখেই তাকে আটকালো এবং প্রাসাদে ঢোকা নিয়ে কথা কাটাকাটি, হট্টগোল আর ধস্তাধস্তি চললো কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত গোলমাল গিয়ে পৌঁছিলো রাজার কানে। তিনি ডেকে পাঠালেম কুঞ্জকে। সে উপস্থিত হ'তেই ভ্রূকুটি ক'রে রাজা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'কি চাই তোমার? গন্ডগোল কিসের?'

কুঞ্জ একেবারে তেড়ে আসে আর কি। রাজাকেই দিয়ে বসলো এক ধমক, 'সে কি রে, নিজের বাপকে চিনতে পারছিস না? দু'দিনের রাজা হয়ে খুব যে দেমাক! অ্যাদ্দিন ধরে মিছেই তবে বাছাই-করা যবের দানা খাইয়ে তোকে নাদুস-নুদুস ক'রে তুললাম! বেড়ে নিমকহারাম তো! গাধা কোথাকার!'

শুনে রাজা তো একেবারে ক্ষেপে অগ্নিশর্মা! সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদাদের ডেকে আদেশ করলেন, 'এই পাজি লোকটাকে আচ্ছা ক'রে উত্তম-মধ্যম দিয়ে প্রাসাদ থেকে দূর ক'রে দাও।'

বেদম মার খেয়ে কুঞ্জ জ্ঞান হারালো। জ্ঞান যখন ফিরলো তখন প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। সে পড়ে আছে রাজপ্রাসাদের অনেক দূরে রাস্তার ধারে। কিন্তু কি আর করে? অনেক কষ্টে পাড়ায় ফিরে এসে রতন মাষ্টারকে বললো সব কথা। সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ চুপ থাকার পর গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, 'এখন একটি মাত্র উপায় আছে। মানুষ হয়েও তোমার গাধাটি যখন অমানুষের মতো কাজ করলো, তখন তাকে আবার গাধাই ক'রে দিতে পারি। রাজি থাকতো বলো।'

তাতেই রাজি কুঞ্জ। বিজ্ঞের মতো বললো, 'তাই করুন মাষ্টারবাবু। গাধার মতো যাদের ব্যভার, গাধা হয়েই তাদের থাকা উচিত।'

অত রাতে সেদিন আর গাধা ফিরিয়ে নেবার কথা বললো না। পরদিন খুব সকালে এসে দেখলো, রতন মাষ্টারের বাগানে তার গাধাটি মনের সুখে চরে বেড়াচ্ছে। কুঞ্জকে দেখে গুটিগুটি এগিয়ে এল কাছে। গতকালের অপমানের শোধ তুলতে কুঞ্জ তেড়ে মেরে গাধার পিঠে কষে কয়েক গাঁট্টা কিল-চড় বসিয়ে দিয়ে বললো, 'হতচ্ছাড়া, গাধা কোথাকার, বেইমান! বাড়ি চল্, হেট্-হেট্!'

রহস্যজনক মৃত্যু

সুব্রত দাস

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। বেশ বড় স্কুল। ছোট্ট মেয়ে লিলি ঐ স্কুলের কেজি ওয়ানের নতুন ছাত্রী। নতুন ছাত্রী হলে হবে কি! এরই মধ্যে সকলের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে। স্কুলের আণ্টি, উঁচু ক্লাসের দিদিরা এমন কি স্কুলের পুরানো দারোয়ান বৃদ্ধ চুণীলালও লিলির দৌরাত্ম্যে আর মিষ্টি কথা-বার্তায় মুগ্ধ। কয়েকদিনের মধ্যে বৃদ্ধ চুণীলাল হয়ে ওঠে লিলির একান্ত কাছের খেলার সঙ্গী। টিফিনে, খেলার পিরিয়ডে জমে ওঠে চুণীলালকে নিয়ে খেলা, লিলির দৌরাত্ম্য সামলাতে বৃদ্ধ চুণী সে সময় হয়ে যায় ছোট্ট শিশু। স্কুলের ঘেরা ময়দানে লিলির ছোট্ট বন্ধুরাও চুণীলালকে নিয়ে মেতে ওঠে খেলায়।

এভাবে মাসের পর মাস চলে যায়। কোকিলের কুহুতানে আসা বসন্ত নেয় বিদায়। আসে রুক্ষমতায় জটাবেশধারী সন্ন্যাসী গ্রীষ্ম। গরমের বাতাস বইতে থাকে হু হু করে। প্রকৃতির রুদ্রতেজী আগুনের বাতাস থেকে রক্ষা পেতে স্কুল,-কলেজে ঘোষিত হয় গরমের ছুটি। গরমের ছুটি পাওয়ার আনন্দে দুলে ওঠে ছোট্ট শিশুদের কচিমন। লিলির স্কুলেও পড়বে ছুটি। একমাস তাকে স্কুলে যেতে হবে না। একথা যতই লিলির মনে হতে থাকে ততই তার মন আনন্দে ভরে ভরে ওঠে। আণ্টিদের কড়া শাসন, পড়া আর পড়া থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দে শিশুর ভোলা মন ডানা মেলে উড়ে চলে স্বপ্ন-ঘেরা জগতে।

সেদিন ছিল বুধবার। প্রতি ক্লাসঘরে আণ্টিরা গরমের ছুটির নোটীশ পড়লেন। থার্ড পিরিয়ডেই ছুটির ঘণ্টা বেজে উটলো। হৈ চৈ করে সব ছাত্রছাত্রীরা ছুটির আনন্দে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো স্কুল-ঘেরা ময়দানে। নিত্যকার মতো স্কুলের বাসে ফিরে চললো সবাই। ফিরলো না শুধু একজন। সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে গেলো অজানা পথে।

ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। মিসেস ক্ষেত্রী ঘড়ি দেখে চমকে উঠলেন। বারান্দায় এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এতক্ষণে স্কুল থেকে লিলির ফিরে আসার কথা। কি হলো? আজ এত দেরী! কোথায় গেল সে? আর দেরী না করে মিসেস ক্ষেত্রী সর্বত্র খোঁজ নিতে থাকেন। লিলির বন্ধুর বাড়ী, প্রতিবেশীদের বাড়ী, এমন কি আত্মীয়দের বাড়ীতেও খোঁজ নেন। সকলের একটিই উত্তর 'না'। দুপুর শেষ হয়ে তখন বিকাল। কখন যে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়েছে হুঁশ নেই। তখনও পাগলের মতো মিসেস ক্ষেত্রী খুঁজে চলেছেন লিলিকে। ফোন করছেন দূর আত্মীয়দের বাড়ী। সেখানেও উত্তর 'না'।

প্রায়ই সন্ধ্যেয় অফিস হতে বাড়ী ফেরেন মিঃ ক্ষেত্রী। বাড়ীর দরজায় প্রতিদিনই লিলি দাঁড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে লিলিকে দেখতে না পেয়ে অবাক্ হয়ে যান তিনি। সদর দরজায় তালা। তালার গায় ছোট্ট একফালি কাগজ। সন্দিহান মন নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে যান। তুলে নেন কাগজটি। কাগজটিতে মিসেস ক্ষেত্রীর দু'লাইন লেখা—

'লিলি হারিয়ে গেছে। ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না'।

কাগজটি পড়ে হু হু করে কেঁদে ওঠেন মিঃ ক্ষেত্রী। কোথায় যাবেন? কোথায় খুঁজে পাবেন লিলিকে! যতই ভাবেন ততই তার চোখের জলে ভরে ওঠে দু'কোণ সন্তান হারানোর বেদনায় মুষড়ে পড়েন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে দৈনিক খবরের কাগজের নিখোঁজ ছেলেমেয়ের কাহিনীগুলি। নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারেন না। এখন তিনি কি করবেন? একথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই ঠিক করে নেন প্রথমেই যাবেন স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের কাছে। সেখান থেকে অন্যত্র।

প্রিন্সিপ্যালের বাড়ী যখন এসে পৌঁছান রাত্রি

তখন আটটা। ঘরে প্রবেশ করার মুহূর্তেই কান্নার শব্দ শুনেই থমকে দাঁড়ান মি. ক্ষেত্রী। বুঝতে পারেন লিলির মা এখানেই আছেন! অনেক কষ্টে প্রবেশ করেন। সামনেই দেখতে পান প্রিন্সিপ্যাল মিস ডোনাল্ডকে। কথাবার্তা হয় অনেকক্ষণ। প্রসঙ্গক্রমে এসে যায় চুনীলালের সঙ্গে লিলির মেলামেশার কথা। একথা ব্যক্তও করেন মিসেস ক্ষেত্রী। সন্দিহান মানব মন। তাই বৃদ্ধ চুনীলালের নিষ্পাপ মেলামেশাও হয়ে দাঁড়ায় দুরভিসন্ধিমূলক।

বৃদ্ধ প্রিন্সিপ্যালের বুকেও বেজে ওঠে লিলি হারানোর করুণ সুর। মিস ক্ষেত্রীর কথাটা ভেবে দেখেন তিনি। এতবড় অঘটন বৃদ্ধ চুনীর পক্ষে সম্ভব হতে পারে বলে ভাবতেও পারেন না। মনে মনে ভাবেন বুড়ো বয়সে কি বিশ্বস্ত চুনীলালের ছেলে ধরার ভীমরতি আসবে? তাছাড়া ওর শিশুদের সাথে মেলামেশাতো আজ নয় বহুদিনের। আজ থেকে ২৫ বৎসর আগে চুনীলাল স্কুলে ঘণ্টা বাজানোর দায়িত্ব নিয়ে যোগদান করেছিল। পরে কর্মে নিষ্ঠা আর বিশ্বস্ততায় নিযুক্ত হয়েছিল স্কুলের পাহারাদারের কাজে। শিশুদের অকৃত্রিম ভালবাসা আর কর্মে নিষ্ঠাই ছিল চুনীলালের গুণ।

তবুও সব ভাবনা ছেড়ে মিস ডোনাল্ড প্রস্তুত হ'ন। ঐ রাত্রেই প্রাইভেট কার-এ রওনা হ'ন তিনজন। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পথ ঘুরে গাড়ী এসে থামে স্কুলে। এত রাত্রে গাড়ীর হর্ণ শুনে বৃদ্ধ চুনীলাল ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। চাদরে মুখ ঢেকে আর লাঠি নিয়ে বড় গেটের সামনে হাজির হয়।

গাড়ী দেখে বৃদ্ধ চুনীলালের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। দরজা খুলে সরে দাঁড়ায় একপাশে। বিস্ময়-ভরা মন থমকে যায়। তোলপাড় করে ওঠে শরীরের শিরা উপশিরাগুলি। এতরাত্রে লিলির মা বাবা হঠাৎ স্কুলে এলেন কেন? গোপন কাজ আছে নাকি? এমন কি কাজ আছে যার জন্যে এতরাত্রে লিলির মা বাবা প্রিন্সিপ্যালের সাথে স্কুলে আসবেন। দরজা বন্ধ করে এগিয়ে আসতেই মিস ডোনাল্ড ডাক দেন—ইউ কাম হিয়ার।

ভয়ে চুনীলালের ক্রমশঃ হাত পার নড়াচড়ার গতি যেন কমে আসতে থাকে। অজানা আতঙ্কে ভরে ওঠে সারা মন। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায় প্রিন্সিপ্যালের কাছে। নিকটবর্তী বেঞ্চে বসতে ইঙ্গিত করেন মিস ডোনাল্ড। ধীরে শুরু হয় কথাবার্তা। প্রতিটি কথায় চমকে ওঠে চুনীলাল। নিজের কানে যেন ভুল শুনতে থাকে। এই নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে তারও যোগ আছে শুনতেই স্থির থাকতে পারে না চুনী। হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে সে। খ্রীষ্টের নাম নিয়ে বার বার বলতে থাকে—'মা, ভালবাসার মধ্য দিয়ে নিষ্পাপ শিশুর ক্ষতি আমি করতে পারি না। ও কি ক্ষতি করেছে যার জন্যে আপনাদের আমি সন্তানহারা করবো।' কান্নাজড়ানো কণ্ঠে কথাগুলি বলে থামতে পারে না চুনীলাল! কাঁদতে কাঁদতে বোবা হয়ে যায় চুনী। তারও যে আদরের ধন লিলি। দৃঢ়ভাবে চাকুরি যাবার ভয় দেখান মিস ডোনাল্ড। বহু টাকার লোভ দেখান মিসেস ক্ষেত্রী। সর্বহারা চুনীলাল যে কে সেই। শুধু ওর মুখে একই কথা বেজে ওঠে'…ও কি দোষ করেছে যার জন্যে আমি আপনাদের সন্তানহারা করবো।' আকুল হৃদয়ে কেঁদে ওঠেন মিসেস ক্ষেত্রী তাহলে বল চুনী, ও কোথায় গেলো?

—স্কুল ছুটী হবার পর মা সবাই চলে গেছে। কেউ ছিল না এখানে। আমি তোমায় এতটুকুও মিথ্যে বলছি নে মা।

মিথ্যে বদনামে সর্বহারা চুনী পড়ে থাকে চার দেওয়ালের মাঝে। সেই রাত্রেই স্কুল হতে বাড়ী ফেরেন সকলে। বহু কাগজে নিখোঁজ লিলির বিজ্ঞাপন বের হয়। বহু জায়গায় খোঁজ করেন মিঃ ক্ষেত্রী! কিন্তু কোনো জায়গা থেকেই লিলির সংবাদ আসে না। ফিরে পাওয়ার আশা দেন সকলে। দিন চলে যায় লিলি আর ঘরে ফেরে না। সন্তান হারা জননী মিসেস ক্ষেত্রী শুধু উদাস নয়নে চেয়ে থাকেন পথের দিকে।

দিন যায় স্কুলের গরমের ছুটীর হয় শেষ। স্কুল গাড়ীর চাকা হয়ে ওঠে সচল। হৈ-চৈ করে ছাত্রছাত্রীর দল জমায়েত হয় স্কুলে। ঘণ্টা পড়ে। যে যার ঘরে চলে যায়। প্রতি ঘরেই গুন গুন করে আলোচনা চলে হারানো লিলির কথা। টিফিন হয়। কেজি

ওয়ানের একটি ছোট্ট মেয়ে পাপ্নু। কলঘরে যায় জল খেতে। খানিকক্ষণ পর ছুটে বেরিয়ে আসে ভূত-ভূত বলে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে। সবাই নড়ে চড়ে ওঠে। বড়রা বলে ওঠে—সে কিরে পাপ্নু! কোথায় ভূত দেখলি ? চল তো দেখি।

—না, বাবা আমি যাব না। ও ঘরে পঁচা গন্ধ। ছোট্ট মেয়ে পাপ্নুর কথা শুনে কৌতূহলবশে কয়েকজন ছুটে যায় কলঘরে। কিছুদূর এগোতেই নাকে ভেসে আসে পঁচা গন্ধ। দ্রুত গতিতে ভূত আর পঁচা গন্ধের খবর পৌঁছে যায় আণ্টিদের কানে। দ্রুত গতিতে ছুটে আসেন আণ্টিরা। ছুটে আসেন প্রিন্সিপ্যাল মিস্ ডোনাল্ড। ভিড় জমে ওঠে বাথরুম-সংলগ্ন কলঘরে। রহস্যজনকভাবে চমকে দেয় বাথরুমের চারি দেওয়ালের আঁকাবাঁকা হাতের লেখনী -"mother give me water, open the door, mother··· mother, I am hungry take me, father where are you ? আরও কত কি! এরপর ছোট্ট গলিত শব দেখে আর কারও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন প্রিন্সিপ্যাল মিস্ ডোনাল্ড। ছোট বড় সকলের চোখে ভেসে ওঠে জল। সেদিনকার মতো স্কুল ছুটী হয়ে যায়। খবর পাঠানো হয় মিঃ ক্ষেত্রী ও মিসেস ক্ষেত্রীকে। ছুটে আসেন তারা। ফুলের শয্যায় তখন চিরঘুমে অশান্ত অবোধ শিশু লিলি। সন্তান হারা জননীর কান্নার জলে ভেসে ওঠে পবিত্র ছোট্ট ফুলগুলি। তারপর নেমে আসে সন্ধ্যা। স্কুলঘেরা প্রাঙ্গণে মানব-আত্মার অসহ্য বেদনায় মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত ভগবান যীশুর পবিত্র ক্রুশখানি বুকে ধরে লিলি ঘুমিয়ে থাকে চিরকাল। আর বৃদ্ধ চুনীলাল তখন অনেক দূরে......।



পদ্মহস্তে মহিলা

সুবিনয় ভট্টাচার্য দ্বারা টাইপ-করা ছবি

'দয়ালু কাঠুরে'

শ্রীমতী গৌরী দে

এক ছিল কাঠুরে।—লোকটা যেমন সরল তেমনি দয়ালু। তার বউটা ছিল কিন্তু ভারি ঝগড়াটী। সারাদিন সে এটা দাও সেটা দাও করে কাঠুরের সঙ্গে ঝগড়া করত। ওদের কোন ছেলেপুলে ছিল না, সারাদিন বনে বনে কাঠ কেটে কাঠুরে সেগুলো বেচে যা পেত তাই দিয়ে দুটো প্রাণীর দিব্যি চলে যায় কিন্তু তাতে কাঠুরে বৌ খুশী নয়। বৌকে খুশী করতে কাঠুরে আরো গভীর জঙ্গলে যায়, খুব পরিশ্রম করে তবু ওকে খুশী করতে পারে না। একদিন মনের দুঃখে কাঠুরে ঠিক করল সকাল বেলা কুড়ুল নিয়ে সে যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাবে—আর ফিরবে না। কুড়ুল নিয়ে—কেননা ওর নিজের তো পেট চালাতে হবে। পরদিন সকাল না হতেই কাঠুরে বেরিয়ে পড়ল।

যাচ্ছে তো যাচ্ছে, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই—এমন সময় দেখল পথের মধ্যে একটা বুড়ো হাড় জিরজিরে গাধা পড়ে আছে। প্রথম সে মনে করল গাধাটা মরা। তারপর কাছে গিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে বুঝল, না তখনও মরে নি। গাধাটা ওকে দেখে বলল "একটু জল দাও।" কাঠুরে তো অবাক গাধা আবার মানুষের মত কথা বলে নাকি। এ আবার কোন দেশে এসে পড়ল সে। বেশী ভাববার সময় পেল না, গাধাটা আবার বলল, একটু জল দাও, প্রাণ যায়। কাঠুরের তো দয়ার শরীর, সে করল কি তাড়াতাড়ি চলল ঝরনার খোঁজে। বেশ খানিকটা যাবার পর দেখল একটা ছোট্ট ঝরণা তিরতির করে বয়ে চলেছে। ও তাড়াতাড়ি ওর গামছাটা জলে বেশ করে ভিজিয়ে নিয়ে গাধাটা যেখানে শুয়ে আছে সেদিকে ছুটল। গামছাটা নিংড়ে জল দিতে গাধাটা একটু সুস্থ বোধ করল। গাধা বলল সে বুড়ো হয়েছে বলে মনিব তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই মনের দুঃখে সে যাচ্ছিল পরীর দেশে, সেখানে গেলে সে আবার যৌবন ফিরে পাবে। কিন্তু পথে একটু জলের অভাবে সে মরতে বসেছিল। ভাগ্যিস কাঠুরে তাকে বাঁচাল—যা হোক তার দয়া সে কখনো ভুলবে না। এই বলে একটা ছোট্ট কাঠি কাঠুরেকে দিল। বলল 'এই কাঠিটা তিনবার মাটিতে ঠুকলে আমি তোমার কাছে হাজির হব।' গাধা চলে যেতে কাঠুরেও আবার চলতে শুরু করল। চলতে চলতে বেলা বয়ে এল কাঠুরের খুব খিদে পেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে সামনেই একটা বিরাট আমগাছ, তাতে অনেক পাকা আম ফলে রয়েছে। কাঠুরে পেট ভরে আম খেয়ে সেই গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল চাঁদের আলোয় একদলে ছোট্ট ছোট্ট পরী সেই গাছের ডালে নেচে বেড়াচ্ছে। তাদের রঙ্গিন জামা-কাপড় ঝলমলে ওড়না, পাতলা ফিনফিনে ডানা। দেখে কাঠুরের খুব মজা লাগল। সারারাত স্বপ্ন দেখে খুব ভোর বেলা কাঠুরের ঘুম ভাঙ্গল। আর তক্ষুণি সে শুনতে পেল কে যেন বলছে "বাঁচাও বাঁচাও, কে আছ রক্ষা কর।" কাঠুরে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে লক্ষ্য করল একটা ঝোপের মধ্যে থেকে শব্দটা আসছে। সে তখন একটু এগিয়ে গেল—তারপর যা দেখল তাতে তার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। দেখে না দেড় আঙ্গুল লম্বা একটা ছোট্ট পরীর ডানাটা ঝোপের কাঁটায় বিঁধে গেছে 'সে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে পারছে না। কাঠুরে বুঝল রাত্তিরে সে যা দেখেছে তাহলে তা স্বপ্ন নয়, সত্যি। সে তাড়াতাড়ি পরীর ডানাটা কাঁটা থেকে ছাড়িয়ে দিল। পরী খুব খুশী হয়ে বলল, "আমরা রোজ রাতে দলবেঁধে ফুলের মধু খেতে আসি। কাল রাতে সবাই চলে যাবার পর আমি সব শেষে যখন যাব, ঠিক এমনি সময় আমার ডানাটা আটকে গেল।" একথা বলে সে কাঠুরের হাতে একটা ছোট্ট রুপোর বাঁশী দিয়ে বলল, "যখন আমায়

দরকার হবে এই বাঁশীটা বাজাবে তবে মনে রেখো মাত্র একবার আমি আসব।

গাধার দেওয়া কাঠি, পরীর দেওয়া বাঁশী নিয়ে কাঠুরে আবার পথ চলতে লাগল।—চলতে চলতে দেখতে পেল দূরে একটা হাট বসেছে। তখন সে ঠিক করল বেশ খানিকটা শুকনো কাঠ হাটে বিক্রি করে কিছু পয়সা কামাবে। এই মনে করে সে একটা শুকনো গাছ যেই না কাটতে গেছে অমনি কে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল—"দোহাই তোমার গাছটা কেটো না, তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব।" কাঠুরে তো অবাক। আশে পাশে কেউ নেই অথচ কি সব ভুতুড়ে ঘটনা ঘটছে কাল থেকে। ওর মনে হ'ল ঠিক গাছের নিচে কি যেন একটা নড়ছে। কাছে গিয়ে দেখে, একটা মেঠো ইঁদুর সামনের পা দুটো জড়ো করে ওর কাছে মিনতি জানাচ্ছে। কাঠুরে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে ইঁদুরটা আবার বলল—'এই গাছটার ঠিক নিচে আমার ছেলেপুলেরা গর্তের মধ্যে ঘুমোচ্ছে। তুমি যদি গাছটাকে কেটে ফেল তাহলে গর্তটা বন্ধ হয়ে গিয়ে ওদের চাপা দেবে।' কাঠুরে তখন বলল, 'কিন্তু এই গাছটা ছাড়া তো আর কাটবার মত গাছ নেই, তবে কি আজ সারাদিন আমায় না খেয়ে কাটাতে হবে।' ইঁদুরটা বলল—'সে জন্যে তুমি ভেবো না। আমি তোমাকে একঘড়া মোহরের সন্ধান দিতে পারি। আমার গর্তের ঠিক পাশেই রয়েছে। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি আমাদের ক্ষতি না করে ঘড়াটা বার করে নিতে পার তবেই আমি ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দেব।' কাঠুরের তো চক্ষু ছানাবড়া। বলে কি! একঘড়া মোহর। অথচ ইঁদুরটার অপকার করাও উচিত নয়। কি করে তবে ঘড়াটা নেওয়া যায়। গর্ত না ভেঙ্গে একাজ করাও অসম্ভব। কাঠুরে ভাবতে লাগল। সব ক্ষিদে তেষ্টা ভুলে কাঠুরে খালি ভাবে। ভাবতে ভাবতে রাত্তির হল—হঠাৎ কাঠুরের খেয়াল হল পরীর কথা। তাড়াতাড়ি বাঁশীতে ফুঁ দিতেই পরী এসে হাজির। কাঠুরের কাছে সব কথা শুনে পরী বলল এ আর এমন কি শক্ত! এই বলে পরী তার হাতের যাদুদণ্ডটা তিনবার ঘুরিয়ে দিতেই কোথা থেকে ঝরঝর করে মোহর পড়তে লাগল। তারপর আবার সেই মোহরের ওপর পরী যাদুদণ্ডটা তিনবার ঘোরাল। সঙ্গে সঙ্গে মোহরগুলো দুটো বস্তায় বোঝাই হয়ে গেল। পরীও অদৃশ্য হয়ে গেল। কাঠুরে দেখল তার হাতে পরীর দেওয়া বাঁশীটাও অদৃশ্য হয়ে গেল! পড়ে রইল গাধার দেওয়া কাঠিটা। কাঠুরে তখন সেই কাঠিটা মাটিতে তিনবার ঠুকতেই কোথা থেকে গাধাটা হাজির! সেই জিরজিরে চেহারাও নেই, সেই বুড়োটে ভাবও নেই। বেশ জোয়ান তাজা চেহারা। কাঠুরেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে গাধাটা বলল—আমি পরীর দেশে গিয়ে যৌবন ফিরে পেয়েছি—বল এখন কি করতে হবে। কাঠুরে বস্তা দুটো দেখিয়ে বলল "আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে পার?" গাধাটা বলল "আমার পিঠে বোঝা দুটো তুলে দাও আর তুমিও উঠে বস।" কাঠুরে ঠিক তাই করল। গাধাটা যেন হাওয়ায় উড়ে চলল। একপ্রহরের মধ্যে কাঠুরে নিজের বাড়ীর কাছে এসে পড়ল।

এদিকে সারাদিন সারারাত কাঠুরে বাড়ী আসেনি বৌ মস্ত একটা ঝাঁটা নিয়ে দোর গোড়ায় বসে আছে, কি না, কাঠুরে এলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়বে। এমন সময় দেখে গাধার পিঠে মস্ত বস্তা নিয়ে কাঠুরে আসছে। মনে করল দুদিন বাদে কাঠুরে দুবস্তা শুকনো কাঠ নিয়ে আসছে তাও আবার একটা গাধা কিনেছে পয়সা খরচ করে! ভাবতেই মাথা গরম হয়ে গেল। ঝাঁটা ফেলে রান্নাঘর থেকে নিয়ে এল চ্যালাকাঠ, আজ কাঠুরের একদিন কি ওর একদিন। কাঠুরে সব বুঝেছে। চ্যালাকাঠ নিয়ে ছুটে আসবে বৌ, মারে কি না মারে এমন সময় বস্তার মুখটা ফাঁক করে ধরে কাঠুরে। চকচক করে ওঠে মোহর—আর বৌ-এর চোখদুটোও লোভে জ্বলে ওঠে। বারবার বৌ চোখ কচলায় আর দেখে। কাঠুরে হাসছে দেখে বৌ ছুটে এসে স্বামীর পায়ে পড়ে—"আমায় ক্ষমা করো, না জেনে কত অপরাধ করেছি।" গাধাটা ঠিক তক্ষুনি অদৃশ্য হয়ে যায়। আর কাঠুরে? বৌ-এর দিকে না তাকিয়ে গান ধরে—

"টাকার এমন গুণ—,
ঝগড়াটী বউ বশ হল ভাই—,
এ যে জোঁকের মুখে নুন!
হায়রে, টাকার এমন গুণ।"

জার্মানীতে চার সপ্তাহ

অসিতকুমার চৌধুরী

জার্মানীর নাম শোন নি, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছো নাকি? আমার তো বিশ্বাস—জার্মানীর কথা তোমাদের অনেকেরই জানা। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর ভূমিকা ছিলো অসাধারণ। আজ জার্মানী দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী। পূর্ব জার্মানী পড়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার ভাগে আর পশ্চিম জার্মানী ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সম্মিলিতভাবে।

কোয়ালালামপুর থেকে সিঙ্গাপুর হ'য়ে আমরা কয়েকজন জার্মানী যাত্রা করলাম। আমাদের রুট ছিলো—সিঙ্গাপুর—বোম্বে—ফ্রাঙ্কফুর্ট। অস্ট্রেলিয়া থেকে "লুফ্‌থানসা" জাম্বো জেট্ এসে দাঁড়ালো সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরের রাণওয়েতে রাত ১০ টায়। ইষ্টনাম জপ করে প্লেনে উঠলাম। তার কারণ কি জানো? ১৫ই নভেম্বর খবরের কাগজে বেরিয়েছিলো তিনটি লুফ্‌থানসা প্লেনকে উড়িয়ে দেবে জার্মান গেরিলারা। তিনটির মধ্যে আমাদের প্লেনটি যে 'টার্গেট' হবে না, কে বলতে পারে? তাই ১৬ই নভেম্বর আমাদের এক জরুরী সভায় আমরা ঠিক করেছিলাম—যে যার দেশে ফিরে যাবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হ'লো জানো? ডঃ ফিশার আমাদের ডেকে পাঠালেন এবং বললেন 'Cowards die many times before their death.' তখন সকলেই একে একে রাজি হ'য়ে গেল জার্মানী যেতে।

রাতের তারা-ভরা কালো আকাশে আমাদের বিমান পাখা মিলেছিলো। নীচে সিঙ্গাপুর বন্দরের আলোগুলো টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলছে। মনে একটা অজানা ভয় তখনও উঁকি মেরে চলেছে। ঠিকমতো পৌঁছবো তো? সিঙ্গাপুর বিমান বন্দর থেকেই একখানা চিঠি লিখে দিলাম ইংল্যান্ডে বড় বোনকে—'নিরাপদে জার্মানী পৌঁছলাম কিনা খবর নিস্'।

রাত দু'টো নাগাদ ভারতের মাটিতে বিমান নেমেছিলো। সেটা কিন্তু ক'লকাতা নয়—বোম্বে। কলিকাতা হ'লে বন্ধুবান্ধবদের খবর দিতাম। কিন্তু সে চিন্তা তখন ক'রে কি হবে বলো? দেশের মাটিতে পা দিয়েও তাদের দেখতে পাচ্ছি না—একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে উড়ে চ'লেছি জার্মানীর পথে। ফিরবো কিনা কে জানে? প্লেনের দরজায় এসে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। রাতের ঘন অন্ধকারে বোম্বের বিমান বন্দরকে ঠিকমতো দেখা গেল না। তবুও নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম আর মনে হ'তে থাকলো—"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা......।" মনটা ডুকরে কেঁদে উঠ'লো—আত্মসংবরণ ক'রে নিজের সীটে এসে আবার বসলাম। প্লেন ছাড়লো ৪০ মিনিট পর। সিঙ্গাপুর থেকে প্লেন ছাড়ার পরই জার্মান এয়ার হোস্টেসের সৌজন্যে ভাত, মটরশুটির সব্‌জি, মাছ, পুডিং প্রভৃতি আমার ভাগ্যে জুটেছিলো। প্রথমে অবশ্য তিনি আমায় বীফ্ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমায় খেতে না দেখে জিজ্ঞেস করলেন—'How can I help you?' নির্ভয়ে আমার অসুবিধের কথাটা নিবেদন করলাম। তখন তিনি আমায় ভারতীয় খানার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাই ভেতো বাঙালীর চোখে নেমে এলো ভাতঘুম। ঘুম ভাঙলো পাইলটের ঘোষণায়—"আমরা এখন ইউরোপে প্রবেশ করেছি।" একটু একটু শীত করতে লাগলো। কম্বল দিলেন হোস্টেস।

আমাদের প্লেন উড়ে চলেছে সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ওপর দিয়ে। কিছুক্ষণ পরেই সূর্য্যিমামা উঁকি দিলেন লাল জামা গায়ে দিয়ে। সাদা মেঘের ওপর লাল আলো—কী সুন্দর, কী অপূর্ব সে দৃশ্য! আমার কলম সে সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারছে না। এই মনোরম পরিবেশে মনে হ'তে লাগলো সারাজীবন বুঝি এমনি করে কাটিয়ে দিতে পারি।

বিমান-সেবিকা সকালের চা ও প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে গেলেন। তার আগে ঈষদুষ্ণ তোয়ালে মুখ-চোখ মোছার জন্য। ব্রেকফাস্ট শেষ হ'লে প্রাতঃকৃত্য করার জন্য ল্যাট্রিনে লাইন। বাইরে থেকে লেখা—ENGAGED বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে ভেতরে লোক আছে।

দেখতে দেখতে 'ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্ট' এসে গেলাম। আমরা তখনও গেরিলা আক্রমণের ভয়ে ভীত। প্লেন যখন ফ্রাঙ্কফুর্টের রাণওয়ে স্পর্শ করলো তখন যাত্রীদের সে কি হাততালির ধুম। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো—আমার মতো প্লেনের সব যাত্রীই ভীত হয়েছিলেন।

জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমান-বন্দরটি কাচের আবরণে ঢাকা। এতো বড় বিমান-বন্দর আমি জীবনে দেখি নি। অসংখ্য গেট, অসংখ্য মানুষের ভীড় বিমান বন্দরের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার জন্যে এস্‌-ক্যালেটারের ব্যবস্থা আছে। 'এস্‌কালেটর' কি জানো? দ্রুত গমনে সাহায্যের জন্য মেকানিক্যাল ব্যবস্থা। কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গেলেই দেখতে পাবে—একতলা থেকে তিন-চারতলায় ওঠা যায় সিঁড়ি না ভেঙে। তাই বলে 'লিফ্‌ট' মনে করো না। অটোম্যাটিক দ্রুত গমন সহায়ক যন্ত্র বলা যেতে পারে, বুঝলে তো?

ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্ট পৃথিবী বিখ্যাত। এয়ার পোর্টের লাউঞ্জে পৌঁছে আমরা নুরেণবার্গ যাবার domestic flight ধরার কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। নুরেণবার্গ বিমান-বন্দরে পৌঁছে দেখলাম—আমার সুটকেশটা ভেঙে গিয়েছে এক জায়গায়। লুফ্‌থানসা অফিসে দেখাতেই তাঁরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমার হাতে দিলেন ৩০ মার্ক। জার্মানীর মুদ্রার নাম 'মার্ক'—এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

নুরেণবার্গে আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল হোস্টেলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা ঘর। ঘরের মধ্যে গরম ও ঠাণ্ডা জলের বেসিন। বিছানা-গুলিও সাদা চাদরে মোড়া। প্রতিঘরে একটা করে কাঠের আলমারী। মাথার কাছে সুদৃশ্য টেবল-ল্যাম্প। নভেম্বরে জার্মানীর শীত তোমরা কল্পনা করতে পারো? দুর্দান্ত ঠাণ্ডা—তাই ঘরগুলোয় 'হিটিং' ব্যবস্থা ছিলো পুরোপুরি।

পরের দিন আমরা সবাই ভীড় জমালাম 'Quelle' ডিপার্টমেণ্টাল শপে। একটা করে ওভার কোট, টুপি, গরম মোজা কেনা গেল।

ফেরবার সময় নুরেণবার্গ শহরের মাঝখানে অবস্থিত বিখ্যাত ঝর্ণা (Fountain) দেখলাম। শহরের যে অংশে মেলা বসে, তাও দেখলাম। তারপর দেখানো হ'ল হের হিটলারের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিচারস্থল। মনে পড়ে গেল অবিভক্ত জার্মানীর দাপটের দিনগুলি। আজ জার্মানী বিভক্ত—ভগ্ন জার্মানীর জন্য জার্মান জাতিরমনও ভগ্ন প্রায়। একমাস ছিলাম আমি জার্মানীতে—ছোটবড় সকলের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি ওরা চায় জার্মানী আবার এক হোক।

পরের শনিবার আমরা গেলাম ওলিম্পিক টাউন মিউনিকে (Munchen)। সেখানে আমরা দেখলাম ওলিম্পিকের বিখ্যাত স্টেডিয়াম ও টাওয়ার। ওই টাওয়ারে উঠলে নাকি আল্পস্‌ (Alps) পর্বত দেখা যায়। কিন্তু তুষারপাতের জন্য আমরা টাওয়ারে উঠতে সাহস করলাম না। ভাবলাম, গরমকালে এলে কি ভালোই না হোত।

যাহোক, আমরা বরফের বল তৈরী করে পরস্পরের গায়ে ছুঁড়ে খেলা করছিলাম। স্টেডিয়ামের পাশে এয়ারকণ্ডিশাণ্ড লেক্‌—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষ—সবাই স্নান করছে। আর একটি লেকে রাজহাঁস সাঁতার কাটছিল। সে দৃশ্য সিনে ক্যামেরায় ধরে রাখলে ভালো হ'তো, নয় কি? তখন তো ভাবি নি, তেমাদের কাছে গল্প বলবো।

পরের শনিবার আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল একটি গ্রামে। নামটা ঠিক মনে নাই আজ। বোধ হয়—অলডর্ফ। এই অলডর্ফে আমাদের সম্বর্দ্ধনা জানালেন গ্রামীণ সভার অধ্যক্ষ। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন জার্মানীর সবচেয়ে পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় দেখাতে। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

নুরেণবার্গে চোদ্দ দিন কাটানোর পর আমরা এয়ারপোর্ট যাবার জন্য এয়ার কণ্ডিশাণ্ড বাসে বসে আছি। হঠাৎ আমাদের হোস্টেলের পরিচারিকা বুড়ি জার্মান মহিলা ছুট এলেন 'ড্রাই ফুড্‌ প্যাকেট' নিয়ে, তাতে ছিলো—সিদ্ধ ডিম, মাখন ও জেলি মাখানো পাউরুটি, কলা, আপেল আরো কত কি? বিদেশে এমন মাতৃস্নেহ পেয়ে দু'চোখে প্রায় জল চলে এসেছিল। বুড়ি আমাদের প্রত্যেককে মাথায় হাত রেখে আবার তাঁর হোস্টেলে আসতে অনুরোধ করলেন।

এয়ারপোর্টে বসে আছি বার্লিন যাবো বলে। হঠাৎ একজন যুবকের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হ'ল। দুজনের মুখই হাসিতে ভরে গেল। এটা একটা সৌভাগ্যের কথা বটে! প্রবাসে বাঙালী চিনতে পারে বাঙালীকে। যুবকটি একবছর হল জার্মানীতে এসেছেন—চাকরী করছেন। কথা প্রসঙ্গে বার্লিন সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি আমায় জানালেন।

বার্লিন পৌঁছে আমরা উঠলাম 'জার্মান ফাউণ্ডেশান' বিল্ডিংয়ে। এখানেও আলাদা ঘর পেলাম। ঘরের নম্বরটি ছিল ২০৯। ঘরগুলি আধুনিক কায়দায় সাজানো—সিংগুল বেড। ধবধবে সাদা

কাগজে ঢাকা। মাথার কাছে টেবল ল্যাম্প—বেড সুইচ! পাশে কাঠের আলমারী—জামা-প্যাণ্ট রাখার জন্য। জানালার পাশে পড়ার টেবল—রাইটিং প্যাড, ডট্ পেন ইত্যাদি। একখানা আরাম কেদারা। বাথ-রুমে পলিথিনের পর্দা দেওয়া শাওয়ার—হট্ ও কোল্ড ওয়াটারের ব্যবস্থা। সুগন্ধি সাবান, দু'খানা সুন্দর রঙীন তোয়ালে।

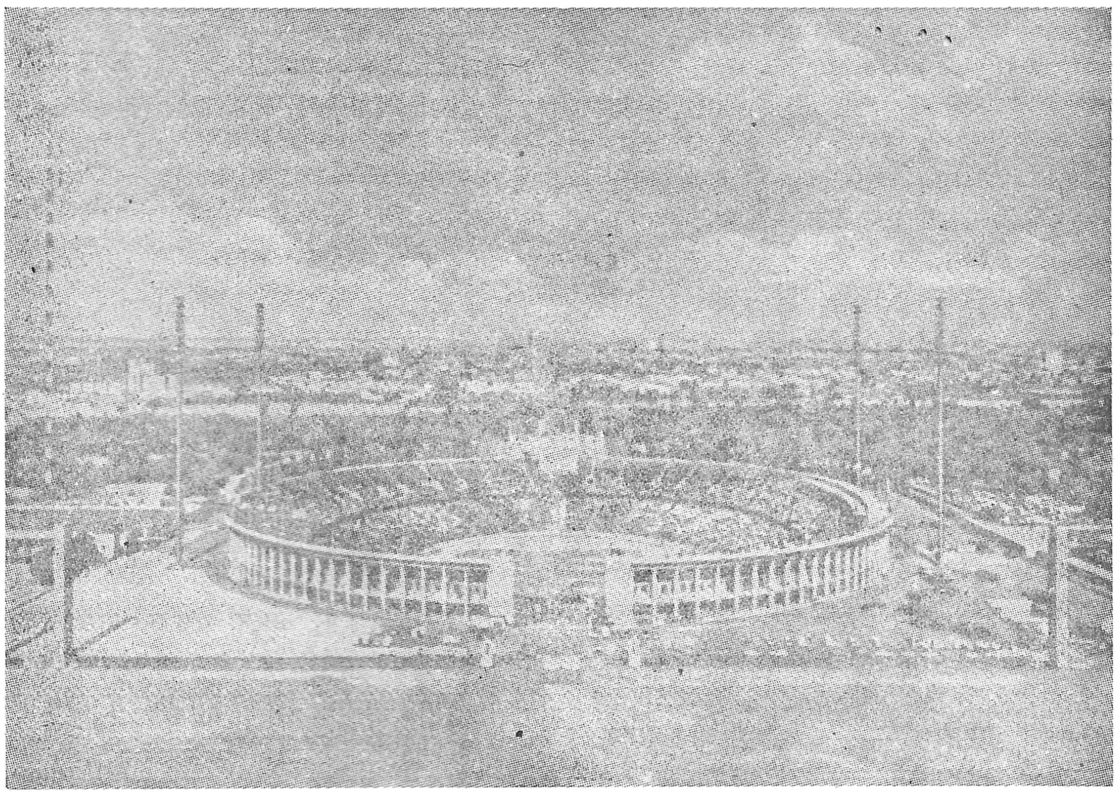
জানালা দিয়ে পূর্ব বার্লিনের T. V. টাওয়ার দেখা যাচ্ছে আর মনটা উদাস হ'য়ে যাচ্ছে।

পরদিন সিটি টুরের দিন। পশ্চিম বার্লিনের যে বড় গীর্জাটির মাথা বোমা প'ড়ে ভেঙে গেছে, সেটা শহরের মধ্যিখানে আজও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়িয়ে।

এখনকার মিউজিয়মে মিশরের 'মমি' দেখলাম। কলিকাতার রেড রোডের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে----পূর্ব বার্লিনের রাস্তাও অত সুন্দর নয়।

পরের রবিবার ছুটির দিন আমরা তিনজন ভারতীয় ও দুজন শ্রীলঙ্কার অফিসার পূর্ব বার্লিন বেড়াতে গেলাম। পাতাল রেলের 'জু গার্ডেন' স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু ক'রে ফ্রেডারিক ষ্ট্রাসেতে ট্রেন বদল ক'রে আমরা পূর্ব বার্লিন পৌঁছলাম। চেকপোস্টে আমাদের পাসপোর্ট দেখে ৬½ মার্ক পশ্চিম জার্মানীর মুদ্রা চেঞ্জ করে ৬½ মার্ক পূর্ব জার্মান মুদ্রা সঙ্গে নিতে হ'য়েছিল। চুপি চুপি বলে রাখছি শোন—পশ্চিম জার্মান মুদ্রার দাম বেশি কিন্তু।

প্রথমেই আমরা T. V. টাওয়ারে ওঠার জন্য 'কিউ দিলাম'। দেড়ঘণ্টা পরে চান্স পাওয়া গেল। লিফটে ক'রে ওপরে উঠতে হয়। টাওয়ারের ওপর একটি



বার্লিনের ওলিম্পিক স্টেডিয়াম

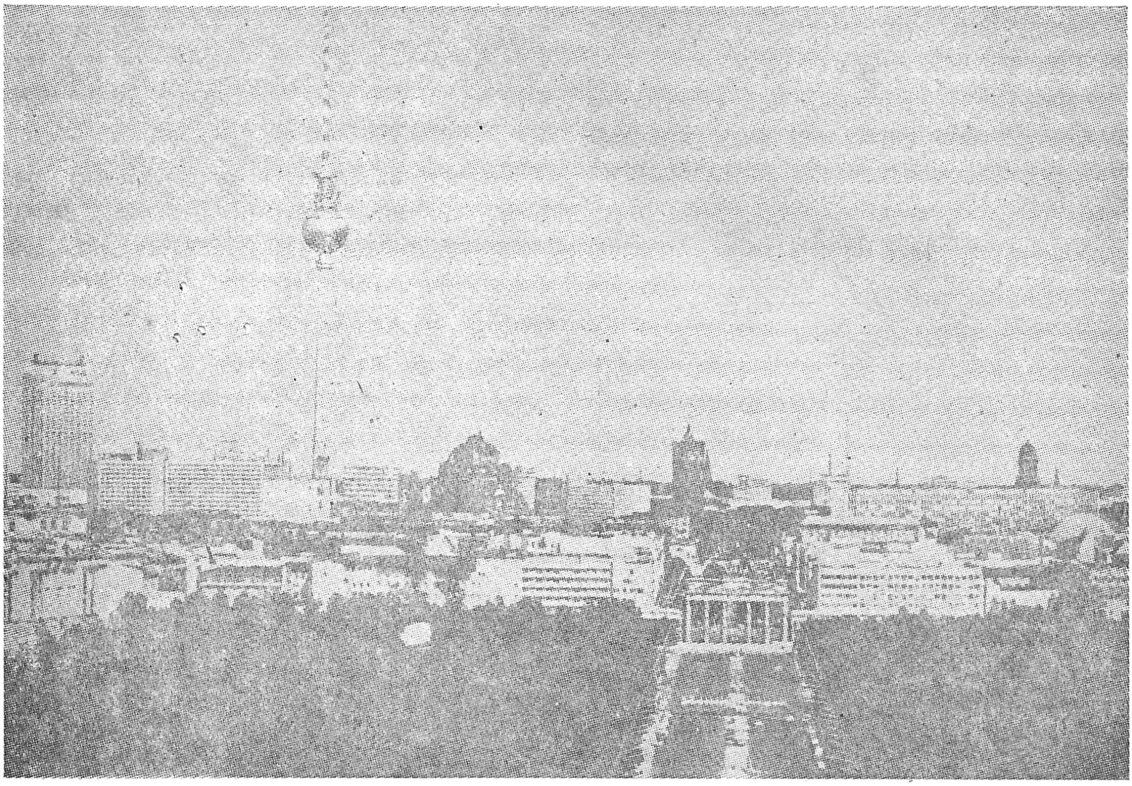
প্রাচীন মিশরের ইতিহাসের কথা মনে পড়ে গেল। তাছাড়া ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের বার্লিন ওলিম্পিক স্টেডিয়ামও আমাদের নিয়ে গিয়ে দেখানো হল।

পশ্চিম বার্লিনের রাস্তাঘাট কেমন জানো? ভালো রেস্টুরেন্টও আছে। দুপুরের খাওয়াটা আমরা ওখানেই সেরে নিলাম।

Tower থেকে নেমে তুষার ঝড়ের মধ্যে আমরা গেলাম পূর্ব বার্লিনের বিখ্যাত মিউজিয়মটি দেখতে।

রাস্তা-ঘাট সব বরফে ঢাকা। মনে হচ্ছিল যেন, সাদা চাদর বিছানো।

বার্লিন শহরকে যে বিখ্যাত দেওয়াল (wall) দুভাগে ভাগ করেছে তা দেখে বড়ই অবাক হ'লাম।



পূর্ব-বার্লিনের টি. ভি. টাওয়ার

মনে হ'ল—একটা কৃত্রিম দেওয়াল দিয়ে কি একটা জাতিকে চিরকাল পৃথক করে রাখা যাবে?

বার্লিনের শ্রমমন্ত্রীর সমকর্মী সেনেটর ম্যাক্সমুলার সাহেব খ্রীষ্টমাস উপলক্ষে তাঁর নিজের বাসভবনে আমাদের জন্য নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। কী মজার ব্যাপার হ'ল জানো? সেদিন আমাদের রাজহাঁসের মাংস খেতে দিয়েছিলেন। কারণ, রাজহাঁসই নাকি খ্রীষ্টানদের পবিত্র পাখী। আমাদের টেবিলেই ব'সেছিলেন একজন জার্মান মহিলা—মিসেস্ স্মিথ্। আমার খাওয়ার রকম সকম দেখে তিনি হেসে গড়িয়ে পড়লেন যেন। যতো আমি বোঝাতে চেষ্টা করি যে, রাজহাঁস খেতে আমরা অভ্যস্ত নই, ততই তিনি হাসির ফোয়ারা খুলে দেন।

জার্মানী থেকে বিদায় নেবার আগের রাতে আমরা জার্মান 'অপেরা' দেখলাম। আমাদের অপেরার সঙ্গে বিশেষ, কোন পার্থক্য চোখে পড়লো না। কেবল অর্কেস্ট্রার বাজনা একটু উন্নত ধরনের বলে মনে হ'ল। জার্মান ফাউণ্ডেশানের সেক্রেটারী মিসেস্ ক্লুপম্যান অপেরার বিষয়বস্তু সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আমাদের পাশে ব'সে। পরদিন ভদ্রমহিলা ও মিঃ মিশেরা বার্লিন এয়ারপোর্টে এসেছিলেন আমাদের বিদায় জানাতে। কেমন ভদ্র বলতো জার্মানীর লোকজন?

এরপর আমরা পাড়ি জমালাম সুইজারল্যাণ্ডের পথে।

খেলাধুলার আসর

খেলাধুলার প্রশ্ন ও উত্তর

শচীন শংকর

প্রশ্ন ঃ জাতীয় ফুটবলে বাংলা এবারেও চ্যাম্পিয়ন হবে তো ? আর বাংলা দলের কোচ কে ?—কৌশিক ও মলয়, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, দেবযানী ব্যানার্জী, গোরাবাজার।

উত্তর ঃ জাতীয় ফুটবলের উপর সবারই নজর এখন। এই লেখা যখন প্রেসে দিচ্ছি তখনও খেলা চলছে সুতরাং জাতীয় ফুটবলের উপর বিস্তারিত রিপোর্ট এর পরের সংখ্যায় লেখার ইচ্ছে রইলো। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি—প্রথমে কোচ ছিলেন অরুণ সিংহ। দল গঠনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত না হওয়ার জন্য উনি পদত্যাগ করেন, এরপর অবশ্য বাংলা দলের কোচিং-এর দায়িত্ব দেওয়া হয় অচ্যুৎ ব্যানার্জীর উপর। হ্যাঁ, বাংলা এবারেও ফেভারিট বৈকি।

প্রশ্ন ঃ বাস্কেটবল খেলার সূত্রপাত কোন্ সালে ?—মধুমিতা দত্ত, বনগাঁ।

উত্তর ঃ ১৮৯১-এ এর শুরু হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ কোন্ ভারতীয় দাবাড়ু আন্তর্জাতিক মাস্টার হয়েছেন ?—বলাই রায়, কলিকাতা-১।

উত্তর ঃ ম্যানুয়েল এ্যারন।

প্রশ্ন ঃ নেহেরু হকিতে কোন দল এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ?—ঝুমা ও রুমা সেনগুপ্তা, নদীয়া।

উত্তর ঃ এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাঞ্জাব পুলিশ। তারা হারিয়েছে ই. এম. ই. দলকে।

প্রশ্ন ঃ ভারতের মেয়েরা কি কোন বিদেশী দলের বিরুদ্ধে ফুটবল খেলেছে বা বিদেশ সফর করেছে ?—রিনা পাল, লিলি দাস, শান্তিনিকেতন।

উত্তর ঃ থাইল্যান্ড, সুইডেন ও ইংলণ্ডের টিভারটন ক্লাব তো ভারতেই এসেছিল। তাছড়া ভারতের মেয়েরা মালয়েশিয়াও সফর করেছে, জিতেও এসেছে বৈকি, আর এবছরই দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা আছে তাইপে এবং হংকং-এ (প্রথম বিশ্বকাপ)। সরকারী অনুমতি পেলে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলও অংশ নেবে।

প্রশ্ন ঃ প্রথম টেস্টেই প্রথম শতরান কে করেছিলেন ?—বিপ্লব পাল, ব্যারাকপুর।

উত্তর ঃ অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান চার্লস্ ব্যানারম্যান করেছিলেন।

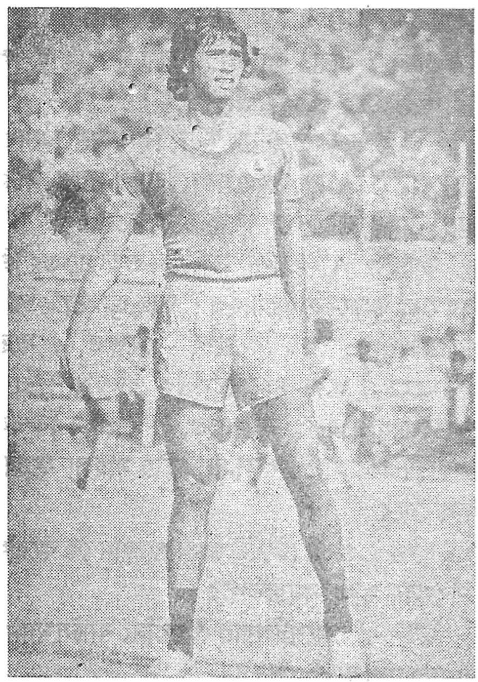
মোহনবাগানের দিল্লী জয়

শচীন কুণ্ডু

ডি. সি. এম. রোভার্সের পর ডুরাণ্ড কাপও কলকাতায় এল। এবারের সাফল্য মোহনবাগানের। ডি. সি. এম. ও রোভার্সে মহমেডান ও ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের কথাতো আগের সংখ্যাতেই লিখেছিলাম। এই তিনটি ট্রফিই ভারতের সেরা প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে অন্যতম। সুতরাং কলকাতায় তিন প্রধানের জয়ে বাংলার সুনামই বেড়েছে। গত মরশুমের লীগ শীল্ড মাঝপথে ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার পর সকলেরই নজর ছিল

এই তিনটি প্রতিযোগিতার উপর। অবশ্য কলকাতার তিন প্রধানই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পেরেছে।

গত মরশুমের শুরুতেই ফেডারেশন কাপে যুগ্ম ভাবে জয়ী হয়েছিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। ছেড়ে কথা বলে নি মহমেডান ক্লাবও। দীর্ঘ দিন পর ডি. সি. এম. ট্রফি জয় করে সমর্থকদের মুখে হাসি এনে দিয়েছিল। এমন কি রোভার্স কাপও জয় করেছে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্মভাবে। এদিকে ডি সি এম ও রোভার্স না পেয়ে মোহনবাগানের সমর্থকরা স্বভাবতই মনমরা হয়ে পড়েছিল।



কমটন দত্ত

অবশ্য পিছিয়ে-পড়া পালতোলা নৌকাও এগিয়ে গেলো ডুরান্ড কাপ জয় করে। ফাইনালে মাত্র ১ গোলে জিতলেও মোহনবাগানের ছেলেরা সত্যিই জান লড়িয়ে খেলেছে মহমেডানের বিরুদ্ধে। ডুরান্ড কাপ জিতবোই এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই ওরা মাঠে নেমেছিল সেদিন। সমস্ত বিভাগেই মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা আধিপত্য বজায় রেখেছিল বৈকি। ১—০ গোলে জয় এসেছে বটে, ৩ গোলেও জিততে পারতো। পারে নি সুবর্ণ সুযোগের অপচয়ের জন্যই। সহজ সুযোগ নষ্ট করেছে মিহির, মানস, বিদেশ ও ডিসুজা। মহমেডানের গোলরক্ষক ভাস্করের জন্যও দু তিনটি অবধারিত গোল হতে পারে নি।

গোল হবে বিদেশও ভাবে নি

তবে বিদেশ যে গোলটি করেছে সেটি সত্যিই অসাধারণ বিস্ময়করও বটে। প্রসূনের কাছ থেকে বল পেয়েই বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে যায় বিদেশ। গোল লাইনের কাছ থেকে জমি ঘেঁষা ব্যাকপাস করে সতীর্থ খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে। বলটি ভাস্করের সামনে দিয়ে কোনাকুনি ভাবে এগিয়ে যায়। ভাস্কর হয়তো ভেবেছিল বলটা পোস্টের বাইরে দিয়েই বেরিয়ে যাবে। একটু দ্বিধা নিয়ে বলটি ধরতে গিয়েও মিস্ করতেই বলটি সেকেন্ড বারের গা ঘেঁষে জালে জড়িয়ে যায়। বিদেশ নিজেও ভাবে নি যে অমন কোণ থেকে শট করে গোল পেয়ে যাবে। যাই হোক এই একটি মাত্র গোলই মোহনবাগানকে ডুরান্ড এনে দিল শেষ পর্যন্ত।

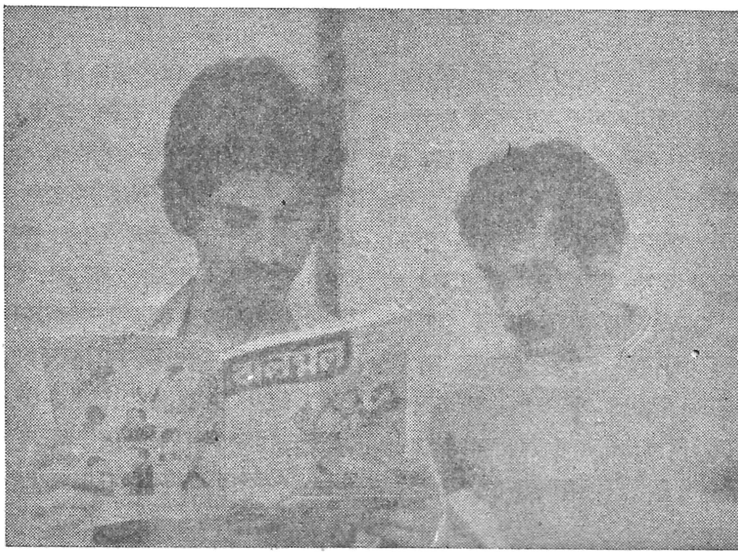


বিদেশ বসু

রকেটের মত শট

দিল্লীর আম্বেদকর স্টেডিয়ামে ডুরান্ড ফাইনালের এই জয়সূচক গোলটির স্মৃতি দর্শকদের যেমন অনেকদিন মনে থাকবে তেমনি মনে থাকবে মহমেডানের ডোনিস উইলিয়ামসনের রকেটের মত শটটির দৃশ্যও। খেলার ৭৫ মিনিটের মাথায় ৪০ গজ দূর থেকে করা এই শটটি যদি প্রথমে বাঁদিকের পোস্টে পরে ডান দিকের পোস্টে লেগে ফিরে না আসতো তাহলে হয়তো ম্যাচটি ড্র হতো। কপাল মন্দ থাকলে যা হয় আর কি।

মানস ও বিদেশের ডানা ঝাপটানি বিপক্ষের ফিলিপস এবং চিন্ময়কে মাঝে মাঝেই বিপাকে ফেলেছে। ওদিকে দুই লিংকম্যান গৌতম ও প্রসূন দুজনেই বুক চিতিয়ে লড়াই করেছে। সে তুলনায় সাদা কালোর দুই জুড়ি প্রশান্ত—অমলরাজ ছিল



সুরজিত সেনগুপ্ত

অনেকটা নিষ্প্রভ। মোহনবাগানের সুব্রত ভট্টাচার্য ও মিহির বসুর অক্লান্ত পরিশ্রমও দলের প্রাধান্য বিস্তারে সাহায্য করেছে বৈকি। আশা ছিল সুরজিৎ সেনগুপ্ত লড়াই করবেন কিন্তু তিনিও সফল হন নি তেমন।

সেরা ম্যাচ

ফাইনাল ম্যাচটিই এই প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ ম্যাচ। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাঠ একটু ভিজে থাকলেও খেলায় বেশ গতি ছিল। মহমেডান হারলেও লড়াই যে করে নি তা নয়। বরং গোল খাবার পর কিছুক্ষণ চেপেও ধরেছিল বিপক্ষকে। এই দিল্লীতেই ডি. সি. এম. জয়ের পর মহমেডানের সাপোর্টাররা যেমন আনন্দে মেতেছিলেন ঠিক তেমনিই ডুরান্ত জয়ের পর মোহন-বাগানের সমর্থকরা উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন। এবার জয়ের ফলে মোহনবাগান ১০ বার (একবার যুগ্ম জয়) ডুরাণ্ড কাপ জয় করলো। মহমেডান ১ বার মাত্র জিতেছিল (১৯৪০)। ডুরাণ্ডের ফাইনালে এর আগে সেই ৫৯ সালে দুটি দল মুখোমুখি হয়েছিল। সেবারও মোহনবাগান জিতেছিল ৩—১ গোলে।

ডুরাণ্ডের ইতিহাস

খেলার কথা বললাম। এবার ডুরাণ্ড কাপের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে লিখছি। ১৮৮৮ সালে স্যার মার্টিনার ডুরাণ্ড-এর চেষ্টায় সিমলাতে প্রথম শুরু হয়। রয়্যাল স্কটস ফ্যাসিলিয়া দল প্রথম ট্রফি জয় করে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত বন্ধ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার জন্য। এরপর ১৯৪৯ সালে আসর বসেছিল। সেবারই প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে মহমেডান ডুরাণ্ড জিতেছিল ব্রিটিশ টীম ওয়ারউইক-শায়ার রেজিমেণ্টকে ৩—১ গোলে পরাস্ত করে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধেয় জন্য এই প্রতিযোগিতা আবার বন্ধ থাকে ১৯৪১ থেকে ৪৯ সাল পর্যন্ত। তারপর ১৯৫০ সাল থেকে দিল্লীতেই প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। আমাদের রাষ্ট্রপতি প্রতিবারই ফাইনালে জয়ী দলের হাতে ডুরাণ্ড কাপটি তুলে দেন। এটাই প্রচলিত নিয়ম এই প্রতিযোগিতার। এবার অবশ্য রাষ্ট্রপতি মাঠে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সৈন্যাধ্যক্ষ ও পি মালহোত্রর হাত থেকে ট্রফিটি নিলেন মোহনবাগানের গর্বিত অধিনায়ক কমটন দত্ত।

ভেঙ্গসরকার এখন অনেক পরিণত

দেবাশিস দত্ত

১৯৭৫-৭৬ মরশুম। নাগপুরে ইরাণী ট্রফির খেলা চলছে রণজি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট ভারতীয় দল প্রতিদ্বন্দিতা করছে। ছ'ফুট লম্বা বলিষ্ঠ চেহারার এক তরুণকে বোম্বাইয়ের পক্ষে প্রথম দিকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে অধিনায়ক গাভাসকার প্যাভিলিয়নে বসে ম্যাসাজ করাচ্ছিলেন। ভাবখানা এই, নতুন ব্যাটসম্যান তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। ঘটনা কিন্তু সেরকমভাবে এগোল না। প্রসন্ন ও বেদীর স্পিন বোলিংয়ের কারিগরী ধূলিসাৎ করে একটি ঝকঝকে সেঞ্চুরীর ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন। বস্তুত ভারতের দুই স্পিনারকে সেই তরুণ মোটেই আমল দেন নি।

বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তরুণ সেদিন দর্শকের মন জয় করা ছাড়াও নির্বাচকদের নজর কেড়ে নিলেন। স্বয়ং গাভাসকার মার মার রব শুনে ম্যাসাজ নেওয়া বন্ধ করে সেদিন সেই তরুণের বেপরোয়া ব্যাটিং দেখতে মাঠের ধারে চলে এসেছিলেন।

তৎকালীন ভারতীয় দলপতি বিষেণসিং বেদী ভারতীয় নির্বাচকদের সেই তরুণের কথা বলায় সহজেই ৭৬-এর গোড়ার দিকে নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে স্থান পেয়ে গেলেন। আশা করি, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমার এ খেলার নায়ক কে? ঠিক ধরেছ, আমি দিলীপ ভেঙ্গসরকারের কথাই বলছি।

প্রথম সফরে ভেঙ্গসরকার কিন্তু পুরোপুরি ব্যর্থ। একজন স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে স্থান পেয়ে ভেঙ্গসরকার কিন্তু সেবার পুরোপুরি নির্বাচকদের খুশি করতে পারেন নি। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তিনটি টেস্টের ছ'ইনিংসে ভেঙ্গসরকারের মোট রান ৮৩। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রথম তিনটি টেস্টে দিলীপ সুযোগ পান। চতুর্থ ও শেষ টেস্টে দিলীপ সুযোগ পেয়ে অসীম সাহসিকতায় সেই "কালা টেস্টে" হোল্ডিং হোল্ডার ও ড্যানিয়েলের বিমার অগ্রাহ্য করে দুটি মূল্যবান ইনিংস (৩৯ ও ২) উপহার দেন। নির্বাচকরা কিন্তু খুব একটা খুশি হতে পারলেন না। ফলে নিউজিল্যান্ড ভারত সফরে এলে দিলীপ সুযোগ পেলেন না। ইংলন্ডের বিপক্ষে একটি টেস্টে সুযোগ পেয়ে সাফল্য পেলেন না কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ কয়েকটি বড়ো রাণের ইনিংস খেলে দিলীপ অস্ট্রেলিয়া সফরের জায়গা করে নেন। দশটি ইনিংসে মোট রান করলেন ৩২০। পাকিস্তান সফরেও মোটামুটি ভাল ব্যাট করলেন। তিনটি টেস্টে মোট রান করলেন ১৮৭। বিশেষজ্ঞদের মতে দিলীপ ব্যাটে রাণ পেলেও ব্যাটিংশিল্পের আদব কায়দাগুলো ব্যাকরণ সম্মত ছিল না। দিলীপও এবারে সতর্ক ছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি নিজের ভুল শুধরে ফেলেন। তবুও একটা ব্যাপারে প্রায় সকলেই দিলীপের দুর্বলতা বলে জানে না। উচ্চতার জন্য পা বাড়িয়ে খেলবার বা ফরোয়ার্ড খেলবার প্রবণতা আছে, এর ফলে শর্ট পিচ বল যে কোন মুহূর্তে ব্যাটের কানায় লেগে ক্যাচ উঠতে পারে।

যাই হোক, পাকিস্তান সিরিজের পর থেকেই দিলীপের ব্যাটিংয়ে প্রভূত উন্নতি ঘটে। ভারতের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এবং ইংলন্ডে দারুণ ব্যাট করে টেস্ট ক্রিকেটে নিজের জায়গা পাকা করে নেন।

বর্তমানে পেস ও স্পিন—কোন আক্রমণই দিলীপকে বেগ দেয় না। আমরাও এখন দিলীপের উপর ভরসা করতে পারছি। বিগত দু-তিনটে সিরিজে গাভাসকার বিশ্বনাথের পাশে মানানসই হয়ে দিলীপ সকলের মন জয় করে নেন, পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। এবার অস্ট্রেলিয়া যাবার আগে পর্যন্ত ৩৬টি টেস্টের ৫৯ ইনিংসে ৫টি সেঞ্চুরী সমেত দিলীপ মোট রান করেছেন ২,০৫৮। ভেঙ্গসরকার আগামী দিনে ভারতীয় ক্রিকেটে এক পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন—এ আশা নিয়ে শেষ করছি।

অস্ট্রেলিয়ায় ভারত

অজয় হোম

অস্ট্রেলিয়ায় সফরকারী ভারতীয় দল ক্রিকেট খেলায় মোটেই সুবিধে করতে পারছে না। বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতীয়দের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল তা ক্রমেই ম্লান হয়ে যাচ্ছে। প্রধান কারণ, গাভাসকার ও বিশ্বনাথ একদম খেলতে পারছেন না। আজ পর্যন্ত যে খেলা হয়েছে তার পর্যালোচনা করলে সেটাই প্রতীয়মান হবে।

১৩ শ খেলা ব্রিসবেনে কুইনসল্যান্ডের বিরুদ্ধে চারদিনের খেলায় ভারত প্রথম ইনিংসে ৩০৮ রান করে। গাভাসকার ৭৯, বেঙ্গসরকার ৭৫, পাতিলের ৬০ রান। গাভাসকার ভালোই খেলেন। তিনি তিনটি ৬ এবং দশটি ৪-এর সাহায্যে এই রান করেন। গ্রেগ চ্যাপেল না খেলতে জিওফ ডিমক অধিনায়কত্ব করে ৫টি উইকেট নেন ১০১ রানে। গত ভারত সফরে এসে তিনি যে অভিজ্ঞতা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে খেলে সঞ্চয় করেন তাই কাজে লাগিয়েছেন। দ্রুত বোলার টমসন পেয়েছেন ৩টি উইকেট ৪৪ রানে (শ্রীনিবাসন আজাদ ও রেড্ডি। তাঁকে দিয়ে বেশি বল করানো হয় নি। কুইনসল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে ২৫৯ রান করে দান ছেড়ে দেয় খেলার আকর্ষণ বাড়াবার জন্যে। যোগরাজ ৭২ রানে ৪, ঘাভরি ৩৫ রানে ৩ এবং বিনির ৩৩ রানে ২ উইকেট। যোগরাজ এই প্রথম সফল হলেন। ভারতের ২য় ইনিংস ৮ উইকেটে ৩৪৪। গাভাসকার ১০৮, পাতিল সেঞ্চুরি করতে পারলেন না ৯৭, বিশ্বনাথ ৪৭, আজাদ ৪০ ও শ্রীনিবাসনের ৩১ রান উল্লেখযোগ্য হলেও খেলা সুবিধের হয় নি। ঝড় বৃষ্টির জন্যে লাঞ্চেই খেলা পরিত্যক্ত হয়। কুইনসল্যান্ড ২য় ইনিংসে ১ উইকেটে ৬২। সুতরাং খেলা ড্র।

১৪শ খেলা। সিডনি মাঠে প্রথম টেস্ট পাঁচদিনের খেলা। অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে ব্যাট করতে দিল ভারতকে ঘাসওয়ালা পিচে। যে পিচে দ্রুত বোলাররা খুবই সুবিধে করবেন। ভেবেছিলাম আগের খেলায় গাভাসকার সেঞ্চুরি করে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন, ভালোই খেলবেন। কোন ভোরে উঠে রিলে শুনছি। তখনও কাক ডাকে নি। ও হরি! সেই শূন্যে রান। যদিও লিলির বলটি ছিল অপূর্ব। তারপর আনকোরা নতুন খেলোয়াড়দের মতো সব খেলা। লাঞ্চে ৫ উইকেটে ৭৮। একমাত্র সন্দীপ পাতিল দেখালেন কী করে এই লিলি পাসকো ও হগের মতো দুর্ধর্ষ বোলারদের খেলতে হয়। পরে টিভিতে দেখছি তাঁর চোস্ত মারগুলো। কিন্তু বিধি বাম। পাসকোর একটা শর্ট পিচ বল বাঁদিকের কানের ওপর লেগে আহত হয়ে মাঠের বাইরে যান। আর ফেরেন নি। হাসপাতালে যেতে হল। ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হল ২০১ রানে। বিশ্বনাথ ২৬, পাতিল ৬৫ অবসৃত, কপিল ২২, কিরমানি ২৭। লিলি ৮৬ রানে ৪, হগ ৫১ রানে ১, পাসকো ৬৪ রানে ৪ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে করল ৪০৬। একাই অধিনায়ক করলে ২০৪। এত ভালো খেলা দেখা যায় না। বর্তমানে দুজন খেলোয়াড়ই আছেন যাঁদের ধারে কাছে কোনো ক্রিকেটার নেই। এক এই গ্রেগ চ্যাপেল, দুই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভিয়ান রিচার্ডস। ভারতের বিরুদ্ধে ব্র্যাডম্যানের সর্বোচ্চ ২০১ রান ছাড়িয়ে গিয়ে রেকর্ড করলেন উইকেট পেলেন কপিল ৯৪ রানে ৫ আর ঘাভরি ১০২ রানে ৫ উইকেট। ঘাভরি একসময় ৫ ওভারে ১৩ রান দিয়ে ৫টি উইকেট নেন। দোশি কোনো উইকেট পান না বিনা মেডনে ২৭ ওভারে ১০৩ রান দিয়েও আরও একজন কপিলের মতো বোলার না হলে অস্ট্রেলিয়ার উইকেট মোকাবিলা করা শক্ত হয়ে পড়ছে। ওদের তিন দ্রুত বোলার কাত করে দিচ্ছে ভারতকে। ভারতের ২য় ইনিংসও শেষ হল সেই ২০১ রানে। ভদ্রলোকের এক কথা। দায়িত্বজ্ঞানশূন্য মেরুদণ্ডহীন ব্যাটিং। কেবল কিরমানি (৪৩ নট

আউট) ও ঘাভরি (২১) নবম উইকেটে ১৯৬৭-৬৮ সালে পতৌদি ও রামাকান্ত দেশাই-এর ৫৪ রানের জুটিকে ছাড়িয়ে ৫৭ করে রেকর্ড করল। গাভাসকার ১০, বিশ্বনাথ ২৪, চৌহান ৩৬, বেঙ্গসরকার ৩৪। লিলি ৭৯ রানে ৩, হগ ২৪ রানে ১, পাসকো ৩৫ রানে ২ এবং হিগস ৪৫ রানে ৪ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৪ রানে জেতে। গাভাসকার অধিনায়ক হবার পর এই প্রথম টেস্ট ম্যাচে হারা। অস্ট্রেলীয়রা খুবই ক্ষুব্ধ ভারতের খেলা দেখে। নিউজিল্যান্ডের চেয়ে ভালো কোথায় ? কলকাতায় অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় নীল হার্ভে বলেই গেলেন সি এ বি-র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে, ভারতের কোনো টেস্টেই জেতার আশা নেই বললেই চলে। মনে পড়ছে, এমনই উক্তি হয়েছিল চার বছর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রথম টেস্ট বারবাডোজে এক ইনিংস ও ৯৭ রানে হারার পর। ঠিক ১২ দিন পর পোর্ট অফ স্পেনে মাত্র কয়েক ওভারের জন্য সম্ভব পর হয় নি। তারপরই ওই মাঠেই ভারতের জয় হওয়াতে সমালোচকদের কথা ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল।

১৫শ খেলা। সিডনি মাঠে একদিনের সীমিত ওভার বেনসন-হেজেস আন্তর্জাতিক খেলায় ভারত হারল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ভারত ২৫.৫ ওভারে পড়ে গেল ৬৩ রানে। গাভাসকার ওপেন না করে ৫নং-এ খেলেও সুবিধে করতে পারলেন না। তা করলেন ১। তাঁর খেলার অবস্থা খুবই খারাপ। বিনি ১৬ আর বিশ্বনাথ ২৩ আর কেউই দশও করতে পারেন নি। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল ১৫ রানে ৫ উইকেট নেন। একমাত্র গ্রীম উডের উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া ৬৪ রান করে ৯ উইকেটে জেতে।

১৬শ খেলা। মেলবোর্ন মাঠে বেনসন-হেজেস কাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সীমিত ওভার খেলা। বৃষ্টির জন্যে ৫০ ওভারের জায়গায় ৩৫ ওভার স্থির হয়। ভারত ৯ উইকেটে ১১২ রান করে। গাভাসকার শ্রীনিবাসনের (৪) সঙ্গে ওপেন করে ৮, বিশ্বনাথ ৩৩, কপিল ২১। নিউজিল্যান্ড কোনো উইকেট না হারিয়ে ১১৩ রান করে জিতে ফাইনাল খেলার সুযোগ করে নিল।

১৭শ খেলা। ওই মেলবোর্ন মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বেনসন-হেজেস কাপের খেলা। ভারত ৫০ ওভারে ১৯৪ মিনিটে ৫ উইকেটে ১৯২ রান করে। গাভাসকার বহুদিন পর একটু খেললেন ৮০, বিনি ২১, বেঙ্গসরকার ৪৬ যশপাল ২১ নট আউট। অস্ট্রেলিয়া ১১০ মিনিটে ৩ উইকেট হারিয়ে ৪৭.৩ ওভারে ১৯৩ করে ৭ উইকেটে জিতে গেল। ভারতের মন্থরগতি ব্যাটিং এই পরাজয়ের কারণ। অস্ট্রেলিয়ার উড ৯৮ নট আউট হয়ে 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' হলেন। ওয়ার্ল্ড সিরিজের এই খেলায় ৮ টিতে ৫টি হারল এবং পরপর ৩টে। বাকি আছে দুটি খেলা।

১৮শ খেলা। দুদিনের খেলা অস্ট্রেলিয়া ক্যাপিটাল টেরিটোরির বিরুদ্ধে ক্যানবেরায় মানুকা ওভালে। বিশ্বনাথ অধিনায়ক। যশপাল (৭৪), আজাদ (৫৬) ও কপিলের (৬৮) জন্য ভারত প্রথম দিনে ৬ উইকেটে ৩০২ রান করে দান ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয় দিনে এসিটি ৬ উইকেটে ৩০৪ রান করে উপযুক্ত জবাব দেয় এবং খেলা ড্র হয়।

১৯শ খেলা। ভারতের বেনসন-হেজেসের ফাইনালে যাওয়ার আশা প্রায় নির্মূল হল। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত হারল ২৭ রানে সিডনি মাঠে। ভারত ৮ উইকেটে ২৪২। গাভাসকার ১, বিনি ৩৪, বেঙ্গসরকার ৫২, বিশ্বনাথ ৭, যশপাল ২৫, পাতিল ২৭, কপিল ২০। অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ২১৫। বর্ডার ৮৫।

২০শ খেলা। ব্রিসবেন মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের বেনসন-হেজেসের শেষ খেলা। ভারত টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠায়। নিউজিল্যান্ড ৫০ ওভারে ২৪২। অধিনায়ক হাওয়ার্থ ৪৫, জারমান কোনি ৪৯। ভারত রান ছাড়াতে পারল না, করল ২২০। গাভাসকর রান আউট ৯, বিশ্বনাথ ৯, বেঙ্গসরকার ৬৬, পাতিল ৪৮। ভারত ১০ টি খেলায় ৭ টিতে হারল। নিউজিল্যান্ড ফাইনাল খেলবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে।

কলকাতায় প্রথম সাঁতার প্রতিযোগিতা

বিশ্বজিৎ দাসঠাকুর

আচ্ছা তোমাদের কখনো মনে হয় নি, যারা বড় বড় বাড়ি, বিরাট বিরাট রাস্তা বা খুব সরু সরু গলি বা থিকথিকে গাড়ির ভিড়ে বসবাস করেন, সেই শহরের মানুষরাও কেন এত সাঁতার শিখতে আগ্রহী। সারা কলকাতা জুড়ে এখন কতগুলো সাঁতার শেখার স্কুল? হেদো, লেক বা গোলদিঘী তো আছেই, আরো বহু রয়েছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আসলে শহরবাসী জেনে ছ যে এত বড় দুনিয়ায় পায়ের তলায় সব জায়গায় মাটি নেই সব স্থান নিরাপদ নয়। শহরের গণ্ডির বাইরে জলও রয়েছে এবং সেখানে আছে বিপদও। অবশ্যি শরীরচর্চাও সাঁতারের একটা বড় অঙ্গ।

কলকাতায় প্রথম সাঁতার শেখার আগ্রহ দেখা দেয় ১৯১২ সালে। বলা যায় ঠেকায় পড়ে। এমনিতে মনে হতে পারে ঘটনাটা খুবই নগণ্য, কিন্তু সেই ঘটনার জের ধরেই কলকাতায় প্রথম সাঁতার শেখার ঐকান্তিক উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল।

১৯১২ সালের ১৯ নভেম্বর। ওয়াই-এম-সি-র একদল তরুণ সদস্য শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়েছিল পিকনিক করতে সারাদিন হইহল্লা করে কাটাবার পর সন্ধ্যের দিকে তারা ঠিক করলো এবার নৌকা করে কলকাতার ফিরবে। অল্প অল্প শীত পড়েছে। কুয়াশা আর চাঁদের আলো পড়ে নদীর বুকে এক আশ্চর্য মায়া। ওরা গান শুরু করলো। অনেকগুলি ছেলে একসঙ্গে হলে যা হয় এরপর শুরু হল লুটোপুটি। এবং তার ফলে টালমাটাল নৌকাটি মাঝগঙ্গায় গেল উল্টে। সদস্যদের অধিকাংশই সাঁতার জানতন না। এই দুর্ঘটনায় সতীশচন্দ্র বালা, অরবিন্দনাথ সেন, রমণীমোহন সেনগুপ্ত, সনৎকুমার গুপ্ত, প্রকাশচন্দ্র মিত্র এবং পি. সীতারাম শাস্ত্রী এই ছজন মারা যায়।

এই দুর্ঘটনায় কলকাতার বুকে সেদিন যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সেই চাঞ্চল্যে অনুপ্রাণিত হয়েই কলকাতার মানুষ একজোট হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সাঁতার শেখার আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে।

এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলন স্যার নীলরতন সরকার, হরিধন দত্ত, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তুলসীচরণ রায় ওয়াই. এম. সির তৎকালীন ক্রীড়া-সম্পাদক ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ক্রীড়া শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ গ্রে এবং ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চীফ ভ্যালুয়ার বয়েজ ব্রুসবারি।

প্রথম প্রতিনিধি সম্মেলন হয়েছিল 'সঙ্গীত সমাজ হলে'। পৌরোহিত্য করেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অধিবেশনেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা সুইমিং অ্যান্ড স্পোর্টস এসোসিয়েশন'।

এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন ম্যাডকস্ এবং সহ-সভাপতি স্যার আর. এন. মুখার্জী। সম্পাদক হরিধন দত্ত এবং সহ-সম্পাদক তুলসীচরণ রায়।

ক্যালকাটা সুইমিং অ্যান্ড স্পোর্টস এসোসিয়েশন নামে এই যে নতুন সংস্থা তৈরী হল, এরা ঠিক করলেন একটা সাঁতার প্রতিযোগিতার অয়োজন করবেন। প্রস্তুতি চলতে লাগলো।

১৯১৩ সালে কলকাতায় সেই প্রথম সাঁতার প্রতিযোগিতা। হয়েছিল কলেজ স্কোয়ারের বিখ্যাত গোলদিঘীতে। এই উপলক্ষে কলকাতায় বেশ একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। আজকাল সাঁতার প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সাধারণ দর্শকদের জন্য টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা না থাকলেও সেই প্রতিযোগিতায় কিন্তু টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। আর টিকিট বিক্রি করে বেশ কয়েক হাজার টাকা আয়ও হয়েছিল।

কলকাতায় তখন বাঙালীদের কোন সন্তরণ সংস্থা ছিল না। ইংরেজদের ছিল। যেমন 'ক্যালকাটা সুইমিং বাথ'। মনে রাখতে হবে তখন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে নি।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আহারিটোলা অঞ্চলের ছেলেরা। তারা গঙ্গায় সাঁতার কাটতেন। তাছাড়া কোন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন অনেক সাঁতারুও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। এছাড়া অবশ্যই ইউরোপীয় সাঁতারুরা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন।

১৯১৩ সালের এই প্রতিযোগিতায় প্রায় সমস্ত বিভাগে ইউরোপীয় সাঁতারুরা প্রথম তিনটি স্থান দখল করে নিয়েছিলেন। শুধুমাত্র ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট একটি বিভাগে বি. ই. কলেজের ছাত্র উপেন্দ্রলাল মুখার্জী প্রথম স্থান এবং সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট একটি বিভাগে ৪৪০ গজ ফ্রি-স্টাইলে পেয়েছিলেন তৃতীয় স্থান। ৪৪০ গজে নিবারণ দে পেয়েছিলেন দ্বিতীয় স্থান এবং ১১০ গজে তৃতীয় স্থান। আর এই দুটোতেই ফার্স্ট হয়েছিলেন তখনকার বিখ্যাত ইউরোপীয় সাঁতারু ভ্যানভাইক।

'ক্যালকাটা সুইমিং অ্যান্ড স্পোর্টস এসোসিয়েশন দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে বাংলাদেশে সন্তরণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থারূপে কাজ করেছেন। ১৯৩০ সালে 'বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন' 'ক্যালকাটা সুইমিং অ্যান্ড স্পোর্টস এসোসিয়েশনের' হাত থেকে সন্তরণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করেন এবং আরও কিছুদিন পর ১৯৩৭ সালে 'বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে এ রাজ্যের সন্তরণ পরিচালনার সর্ববিধ অধিকার লাভ করেন 'বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশন।'

দিগ্বিজয়ী রঘু

উমা সেনগুপ্ত



দিগ্বিজয় কথাটা তোমরা বোঝোতো? তখনকার রাজাদের জয়ের একটা নেশা ছিল। সত্যিকারের যারা বড়, তাঁদের লোভ ছিল কম, তবুও বিশাল সেনাদল নিয়ে দিগ্বিজয় করতে বেরোতেন। সকল রাজাদের হারিয়ে যশ অর্জন করতেন। তখন তাঁদের চক্রবর্তী অথবা সম্রাট বলা হোত। তখন আবার দিগ্বিজয় করে একটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। যজ্ঞটা রাজসূয়, অশ্বমেধ বা বিশ্বজিৎ হতে পারতো। অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজা তাঁর সৈন্য সঙ্গে দিয়ে একটা অশ্ব ছেড়ে দিতেন। সে যেখানে খুশি যেতো, কেউ তাকে আটকাতে সাহস করতো না। যদিও কেউ আটকাতো, তবে তাকে পরাজিত করে অশ্ব বহুদেশ থেকে ঘুরিয়ে সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে পারলে রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিকারী হতেন।

রাজসূয় যজ্ঞও অনেকে করতেন। বিশাল এক যজ্ঞ ফাঁদা হতো। সব রাজারা এসে এই দিগ্বিজয়ী রাজার যজ্ঞের কাজে সহায়তা করতো। একরকম সেবা করতেন বলতেও পারো। এর জন্যেই এর নাম হল রাজসূয়। যজ্ঞের শেষে বিজয়ী রাজা সব রাজাকেই সসম্মানে নানাবিধ উপহার দিয়ে বিদেয় করতেন। বস্তুত বিজয়ী রাজা লোভের বশে কারুর রাজ্য কেড়ে নিতেন এমন বড় হোত না। কিন্তু যুদ্ধে যিনি বাধা দিতেন তাঁকে শায়েস্তা করা হোতো বটে।

আর একটা যজ্ঞ হোল বিশ্বজিৎ। দিগ্বিজয়ের পরে রাজা এই যজ্ঞ করতে অধিকারী হোতেন। বহু রাজার কাছ থেকে নানাবিধ উপঢৌকন নিয়ে আসা হোত বটে, কিন্তু সব কিছুই আবার অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া হোত। যজ্ঞেতে সর্বস্বই দক্ষিণা দেওয়া হ'ত। রাজা একেবারে ফকির হয়ে যেতেন।

এমনি একজন রাজার কথা আজ তোমাদের বলবো। সূর্যবংশে রঘু নামে এক প্রবল প্রতাপ রাজা ছিলেন। তাঁর পিতার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া

দেবরাজ ইন্দ্র চুরি করে নিয়ে গেলে, তিনি যুদ্ধ করে ইন্দ্রকেও তুষ্ট করেছিলেন।

রঘু দিগ্বিজয়ে বেরুলেন। কেউ তাঁকে রুখতে পারলো না। বহু ধনরত্নাদি সংগ্রহ করে রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। যজ্ঞে দক্ষিণা দেওয়া হ'ল তাঁর সব কিছুই। যজ্ঞের শেষে যা কিছু ছিল সবই বিলিয়ে দিলেন। তাঁর ধনরত্নের পাহাড় একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। আগে সোনা রুপার পাত্রে করে দানধ্যান করতেন, এখন শুধুই মাটির পাত্র ছাড়া আর কিছুই রইল না। এমন সময় প্রার্থী হয়ে এলেন এক বিশিষ্ট বিদ্বান ব্রাহ্মণ। রাজা পাদ্য অর্ঘ দিয়ে প্রার্থী ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু উপকরণ সবই মাটির পাত্রে করে এলো। বেচারী প্রার্থী এসে পড়েছেন বড্ড দেরীতে। তখন রাজভাণ্ডার একেবারেই খালি।

রাজা মধুর বাক্যে প্রার্থীকে আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু শুধু মিষ্টি কথায় তো চিঁড়ে ভেজে না। প্রার্থীটির যে প্রার্থনা বিশাল কিছু। তিনি রাজার গোছগাছ দেখে রাজাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। এখন তো আর কিছুই পাওয়ার আশা এখানে নেই।

রঘু কিন্তু এতে রাজী হলেন না। বললেন, কি গো ঠাকুর, কি চাই আপনার? লোকটির নাম ছিল কৌৎস। কৌৎস বললেন, মহারাজ আপনি দান করে নিঃস্ব হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। আপনার মহত্ত্বের আমি অশেষ প্রশংসা করি। কিন্তু মেঘে জল একটুও না থাকলে চাতকও মেঘকে পীড়ন করে না। আমি গুরু দক্ষিণার জন্য অন্যত্র যাচ্ছি। আপনার কল্যাণ হোক, জয় হোক। রঘু বললেন, এটি কি করে হবে ঠাকুর। আপনি বলুন, গুরুদক্ষিণা কি পরিমাণ?

কৌৎস বললেন, রাজাধিরাজ! পাঠ সাঙ্গ করে গুরুদেবকে কিছু দক্ষিণা নেওয়ার জন্য নিবেদন করলাম।

তিনি বলতেন, আরে বাছা, তোমার যে আমাতে অচলা ভক্তি আছে তাই আমি গুরুদক্ষিণা নিলুম।

আমি তবুও পীড়াপীড়ি করতে লাগলুম—দক্ষিণা না দিলে অধ্যয়ন যে সম্পূর্ণ হয় না। এবার গুরুদেব গেলেন চটে। এত দম্ভ তোমার! বেশ, আমার ঠাঁই চৌদ্দটি বিদ্যা তুমি শিখেছ তবে চৌদ্দকোটী স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা নিয়ে এসো। আমার ভাগ্যদোষে দেখছি আপনি একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়েছেন। তা আমি চলে যাচ্ছি, অনুমতি করুন।

রঘু বললেন, আপনি দু'তিন দিন আমাকে সময় দিন। আপনার টাকা সংগ্রহের চেষ্টা আমি এই কদিনে করি। রাজা ছিলেন একেবারে দুঁদে, ভয়ডর কাকে বলে জানতেন না। তিনি মনে মনে স্থির করলেন কুবের তো হিমালয়ে বাস করেন। সে তো আমারই রাজ্য। তবে তিনি কর তো কিছুই দেন না! আজ তাকে জয় করতে যাবো। পরের দিন রাত ভোর হওয়ার আগেই রাজার আদেশ মতো রথ তৈরী হ'ল—কুবেরের কাছ থেকে কর আদায় করতে মহারাজ যাবেন। কিন্তু প্রভাতের দিকে কোষাধ্যক্ষ এসে খবর দিলেন, মহারাজ! কোষাগারে আকাশ থেকে স্বর্ণবৃষ্টি হয়েছে।

যাক, প্রার্থীটিকে আর বেশী দেরী করতে হল না। উট আর অন্যান্য জানোয়ারের পিঠে বিশাল বিশাল বোঝা চাপানো হ'ল। বহুকোটী স্বর্ণমুদ্রা রাজার ভাণ্ডার উজাড় করে দেওয়া হ'ল প্রার্থীটিকে। তিনি যতই বলেন, আমি চৌদ্দকোটির বেশী নেব না, রাজা ততই বলেন আপনার জন্য টাকা এসেছে সবই আপনাকে নিতে হবে। নিরুপায় কৌৎসকে অবশেষে সবই নিতে হ'ল।

এই ছিলেন দানবীর মহারাজ রঘু। তোমরা যে রামচন্দ্রের কথা শুনেছ, সেই রামচন্দ্র এই রঘুর বংশেই জন্মেছিলেন। রামচন্দ্র রঘুর প্রপৌত্র।

ঝলমল

তাপস বণিক্

ছোট-বড় সকলের মন জয় করে,
ঝলমল' উঠছে যে সবার উপরে।
মনের সুখাদ্য যাহা সব এতে পাই,
'ঝলমল'-সকলের এত প্রিয় তাই।
তাড়াতাড়ি কিনে পড় এই বই সবে,
মনটা তোমার তবে, সদা ভাল রবে।

দুর্গের ধনরত্ন লাভ

অপর্ণা বসু

(জাপানী রূপকথা অবলম্বনে)

সে অনেকদিন আগেকার কথা। জাপানের কোনো একটা গ্রামে গোমবী নামে একটি লোক বাস করতো। সে শুধু গরীবই ছিল না, বুদ্ধিতেও অসম্ভব খাটো ছিল। কোথাও তার নিজের বলতে কেউ ছিল না। সে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে একা একা বাস করতো। গোমবী এত সরল আর বোকা ছিল যে কেউ তাকে বিয়েও করতে চাইতো না।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় এই গোমবীরই বাড়ির দরজায় একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে এসে দাঁড়ালো। এরকম সুন্দরী মেয়ে সে জীবনে দেখে নি। মেয়েটির রূপের ছটায় তার ছোট্ট ঘরখানা যেন আলোয় ভরে গেল। মেয়েটি গোমবীর কাছে রাতের মতো আশ্রয় চাইলো। গোমবী তো আনন্দে একেবারে আত্মহারা। তার বাড়ীতে কেউ আসে না—আর এমন একজন সুন্দরী মেয়ে কিনা তার বাড়ীতে থাকতে চাইছে। সে মেয়েটিকে থাকতে দিয়ে নিজেই যেন ধন্য হয়ে গেল।

সেই রাতে খাওয়া দাওয়ার পর মেয়েটি গোমবীকে বললো, 'তুমি এই বাড়িতে একা থাকো। মনে হচ্ছে তোমার কেউ নেই। আমিও একা। আমার কেউ কোথাও নেই। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

গোমবী তো শুনে একেবারে তাজ্জব। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে সত্যি শুনছে তো? আজ সকালে সে যে কার মুখ দেখে উঠেছিল সে কথাই ভাবছিল গোমবি। এতবড় সৌভাগ্য যে তার জন্য অপেক্ষা করছিল তা সে ভাবতেই পারে নি। সে এক মুহূর্ত আগেই ভাবতে পারে নি। সে আর অপেক্ষা না করে পরের দিনই মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেললো।

সুন্দরী বউ পেয়ে গোমবী তো ভারী খুশী। কিন্তু মুশকিল হ'লো কি জান? মুশকিল হ'লো তার কাজ নিয়ে। তার নিজের কাজে অনবরত ভুল করতে লাগলো। সে তার কর্তাকে এত ভালবেসে ফেললো যে সে কিছুতেই তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। সামান্য এক মুহূর্তের জন্যও না। গোমবী তার বউয়ের দিকে চোখ রেখে খড়ের চটি বানায় ফলে সেগুলো পাঁচ ছ'ইঞ্চি বড় হয়ে যায়, তার খেয়াল থাকে না। খড়ের বর্ষাতি বানায়, সেগুলোও বেখাপ্পা হয়ে যায়। সুতরাং কে আর তার জিনিস কিনবে বলো? এরকম বেমানান জিনিস তো আর পয়সা দিয়ে কেউ কিনতে পারে না।

অগত্যা গোমবী মাঠে গেল কাজ করতে। কিন্তু সেখানে গিয়েও কি তার শান্তি আছে? একমিনিট কাজ করে আর দৌড়ে বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করে, 'ওগো! আমার সোনা বউ, এখন তুমি কি করছো?' বুঝতেই পারছো এরকম করার জন্য একদিনে তার খুব সামান্যই কাজ এগোবে।

গোমবী বোকা হলেও তার বউ কিন্তু বোকা নয়। সে বলল, 'এরকম করে তো আর চলতে পারে না। তখন অনেক ভেবে চিন্তে সে একটা উপায় বের করলো। গোমবীর বউ সোজা শহরে চলে এলো। সেখানে এসে সে একজন ভাল শিল্পীকে দিয়ে তার ছবি আঁকিয়ে নিয়ে এল।

সে ফিরে এসে তার স্বামীকে বললো, দেখো তুমি যেখানে কাজ করো তার কাছেই একটা তুঁত গাছ আছে। সেখানে আমার এই ছবিটা ঝুলিয়ে রাখবে। তাহলে আমাকে দেখবার জন্য অনবরত কাজ ফেলে তোমাকে বাড়িতে ছুটে আসতে হবে না।

গোমবী তার বউয়ের কথামতো কাজ করলো। সে হাতের কাজ থামিয়ে মাঝে মাঝে বউয়ের ছবির দিকে

তাকিয়ে থাকে। কিন্তু আগের মতো ঘন ঘন বাড়ীতে ছুটে আসে না।

বেশ ভালই চলছিল। কিন্তু একদিন হলো কি জান? হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে ছবিখানা উড়িয়ে নিয়ে গেল অনেক উঁচুতে। গোমবী অনেক চেষ্টা করলো ছবিখানা ধরতে কিন্তু কিছুতেই পারল না। বাতাস ছবিখানা উড়িয়ে নিয়ে গেল তার একেবারে নাগালের বাইরে। তখন সে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এল। ফিরে এসে বউকে সে সব কথা খুলে বলল। গোমবীর বউ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'কিচ্ছু ভেবো না। আমি আবার শহরে গিয়ে ঠিক এরকম একটা ছবি আঁকিয়ে আনব।'

কিন্তু এদিকে হাওয়ায় উড়ে যাওয়া ছবিটা নিয়ে কি কাজ হয়েছে শোন। ছবিটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে একটা দুর্গে এসে পড়েছে। সেই দুর্গের অধিপতি ছবিটা দেখে একেবারে কাঠ। ছবির মেয়েটাকে তার দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। সে ভাবলো ছবি যখন পাওয়া গেছে তখন আসল মানুষটাকে খোঁজ করলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তখনই সে তার লোক-জনদের আদেশ দিল, 'এক্ষুনি যাও, যেখান থেকে পারো এই ছবির মেয়েটাকে খুঁজে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

তক্ষুনি দুর্গের লোকজনেরা ছবিখানা নিয়ে সদল-বলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে তারা এসে পৌঁছল সেই গ্রামে—যে গ্রামে গোমবী এবং তার বউ বাস করে। সেই গ্রামে এসে তারা সেখানকার অধিবাসীদের ছবিখানা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা একে দেখেছো?'

'কেন দেখবো না?' তারা সমস্বরে বলে উঠলো, 'এতো আমাদের গোমবীর বউ।'

তারা গোমবীর কুঁড়ে ঘরে এসে দেখলো, সত্যিই ছবির মতো অবিকল সুন্দরী একটা মেয়ে সেখানে রয়েছে।

চলো একবার একে আমাদের অধিপতির কাছে নিয়ে যাওয়া যাক। এই বলে দুর্গের লোকেরা গোমবীর বউকে ধরে নিয়ে যেতে চাইল।

ওকে তোমরা নিয়ে গেলে আমি আর বাঁচব না। এই রকম অনেক কাতরভাবে অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলো গোমবী। কিন্তু দুর্গের লোকেরা তার কোন কথায় কান দিল না। তখন গোমবী এমন কান্না জুড়ে দিল যে তার চোখের জলে একটা ছোট্ট পুকুর হয়ে গেল।

স্বামীর এমন কান্না দেখে গোমবীর বউয়ের চোখ দিয়েও জল বেরতে লাগলো। কিন্তু চোখের জল মুছে ওর বউ ওকে ডেকে বললো, 'অমন করে কেঁদো না গোমবী। আমরা এখন কিছুই করতে পারবো না। আমাকে এদের সঙ্গে যেতেই হবে। তবে আমার কথা শোনো। নতুন বছরের আগের দিন তুমি দুর্গে আসবে। তার সঙ্গে নিয়ে আসবে নতুন বছরে গেট সাজাবার জন্য পাইন গাছ। তখন আমাদের আবার দেখা হবে এবং দেখবে সব গোলমাল মিটে যাবে।'

গোমবীর বউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দুর্গের লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে চলে গেল।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস কাটে আর গোমবী ভাবে কবে সেই দিনটি আসবে। অবশেষে একদিন সে একজনের মুখে শুনলো ঠিক পরের দিনটাই নাকি নতুন বছর। সে কথা শোনবার পর গোমবী আর একটুও দেরী না করে পিঠে এক বোঝা পাইন গাছ চাপিয়ে সে দুর্গের অভিমুখে রওনা হ'লো। আর কিছুক্ষণ পরেই সে তার বউকে দেখতে পাবে এই ভাবনায় সে খুশীতে একেবারে ভরপুর হয়ে উঠলো।

গোমবী দুর্গের দরজার কাছে পৌঁছে চীৎকার করে হাঁকতে সুরু করলো, পাইন গাছ। পাইন গাছ। নতুন বছরের জন্য চমৎকার পাইন গাছ।

তার গলার স্বর দুর্গের ভিতরে তার বউয়ের কানে গিয়ে পেঁছাল। এতদিন বাদে গোমবীর গলার স্বর শুনতে পেয়ে সে আনন্দে হেসে ফেললো। আর সেই হাসি দেখে দুর্গের অধিপতি তো খুব-উব খুশী। কারণ যখন থেকে মেয়েটিকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তখন থেকে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই এর মুখে হাসি ফোটানো যায় নি। এই প্রথম তার মুখে হাসি দেখে সে এত খুশী হল যে, তক্ষুনি তার লোকজনদের ডেকে বললো, 'যে লোকটা পাইন গাছ বিক্রি করছে তাকে এখনই ভেতরে নিয়ে এস।'

যখন গোমবী ভেতরে এল তখন তার বউকে আরও

খুশী দেখাল। সে আনন্দভরা চোখ নিয়ে গোমবীর দিকে তাকাল। দুর্গের অধিপতি ভাবল, এই পাইন-বিক্রেতা যদি তাকে এরকম খুশী করতে পারে, তাহলে আমিও একজন পাইন বিক্রেতা সেজে ফেলি না কেন। আসল ব্যাপারটা তো আর তার জানা ছিল না।

দুর্গের অধিপতি গোমবীর সঙ্গে নিজের পোষাক পালটে নিল। তারপর সে গোমবীর ছেঁড়া পোষাক পরে নিয়ে বাগানের মধ্যে নেমে গিয়ে চীৎকার করে হাঁকতে শুরু করলো, 'পাইন গাছ। পাইন গাছ। নতুন বছরের জন্য সুন্দর পাইন গাছ।'

গোমবীর বউ এই দৃশ্য দেখে আরো খুশী হয়ে জোরে হেসে উঠলো, দুর্গের রাজা এতে আরও উৎসাহ পেয়ে কাঁধে পাইন গাছের বোঝা নিয়ে নেচে নেচে হাঁকতে শুরু করলো পাইন গাছ! পাইন গাছ···। এইভাবে চীৎকার করতে করতে কোনো দিকে লক্ষ্য না রেখে সে গেটের বাইরে চলে এলো।

আর যেইমাত্র সে গেটের বাইরে চলে গেল অমনি গোমবীর বউ লোকজনদের ডেকে বলল, 'শীগগীর দরজা বন্ধ করে দাও।'

অল্প সময় পরে দুর্গের অধিপতির খেয়াল হ'ল 'আরে তাইতো। আমি তো দুর্গের ভেতরে নেই। তখন সে গেটের কাছে ছুটে এসে বন্ধ দরজায় বার বার করাঘাত করে বলতে লাগল, 'আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও। আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও।

কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াও এল না। দরজাও খুললো না।

দুর্গের ভেতরে ছিল অনেক ধনরত্ন। সবই গোমবী আর তার বুদ্ধিমতী বউয়ের দখলে চলে এল। আর সে সব নিয়ে তারা দুজনে আরামে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগলো।

নতুন পৃথিবী

সুখেন্দু দত্ত

(সাঁওতালি উপকথা)



সে কতকাল আগের কথা।

সুখে দিন কাটায় তখন মানুষ। অভাব নেই, অনটন নেই, রোগ নেই, শোক নেই। মৃত্যুও নেই। বড় আনন্দে আছে মানুষ।

এমনি সুখে থাকতে থাকতে খারাপ হয়ে ওঠে তারা। কেউ কারও কথা শোনে না। ঠাকুরজীউকেও মানে না। মানুষ জীবজন্তু, গাছপালা সকলেই!

দেখে ভারী দুঃখ হয় ঠাকুরের। ধরল টরম কিছু মানে না মানুষগুলো। গাছপালা কীটপতঙ্গ সবাই পাপী। বনের পশু, পাখিরাও।

তাদের সবাইকে একদিন ডাকেন তিনি।

ঠাকুরজীউর ডাক শুনেও পৃথিবীর মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ কেউ আসে না। তিনি তখন ডাকেন পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুঢিকে। তারাই পৃথিবীর আদি পুরুষ আর আদি নারী। ঠাকুর যাদের নিজের হাতে বানিয়েছেন।

তারা এসে গড় করে ঠাকুরের পায়ে, বলে ঠাকুর, আমাদের ডাকলি কেন?

তিনি বলেন, 'দেখ পৃথিবীটা গড়লাম। এত বড় করলাম। তা, এখন আমার কথা কেউ আর শোনে না। পাপ নেমে এসেছে পৃথিবীতে। ধরল টরম সব মিছা হয়ে গেছে! এখনও আমার কথা শুনে ভাল হয়ে না চললে কাউকে আমি রাখব না।'

বুড়া-বুড়ি উপুড় হয়ে পড়ে ঠাকুরের পায়ে, 'অবোধ ওরা। ওদের অপরাধ তুই নিস না ঠাকুর। আর একবার ডাক তুই ওদের!'

ঠাকুরের ডাকে তারপরও তারা আসে না। দেখে মাথা নাড়েন ঠাকুর। বুড়া-বুড়িকে বলেন, 'তোরা পাপ করিস নাই। তাই খুশী আছি আমি। তোদের বাঁচায়ে রাখব। ধরমকে রাখিস তোরা। গোটা পৃথিবীটাকে জলে ডুবায়ে দেব আমি! তাহলেই সব সব পাপ ধুয়ে যাবে।'

'কোপ হয়েছে ঠাকুরের। পিলচু হাড়াম আর



ঠাকুর কটাক্ষ করেন

পিলটু বুটির মন খারাপ হয়ে যায়। ঠাকুর আবার বলেন, 'যা তোরা। ঐ হারাতা পাহাড়ের গুহায় ঢুকে বসে থাক।'

বুড়া-বুড়ি কি আর করে! হারাতা পাহাড়ে উঠে তার একটা উঁচু গুহায় গিয়ে বসে।

আকাশের এক কোণে তখন কালো একবিন্দু মেঘ দেখা দেয়। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তারা সেই মেঘের পানে। দেখতে দেখতে মেঘ ফুলে ফেঁপে ছেয়ে ফেলে সারা আকাশ। চারিদিক কালো হয়ে ওঠে। শোনা যায় গুরু গুরু গর্জন!

'বাবাঠাকুর তালে খেপলেন!' বুড়ো বলে। 'তা খেপবেনই তো।'

গুহায় বসেই তারা শুনতে পায় বাতাসের সোঁ-সোঁ আওয়াজ। গোঁ-গোঁ শব্দে ছুটে যায় পাগলা হাওয়া। তোলপাড় করে তোলে সারা আকাশ।

বুড়ি বলে, 'ঝড় নামবে।'

বুড়ো বলে নামবে কি? নেমেছে। ওই দেখ। নিচে ধুলোর মেঘে ঢেকে গেছে তখন পৃথিবীর সব কিছু। মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ সকলে চিৎকার করে ওঠে, মারং হায়দা, মারং হায়দা। ঝড়, ঝড়।'

ঠাকুর তাদের দিকে চেয়ে অট্টহাসি হাসেন। ঝড় প্রবল হয়ে ওঠে তাঁর হাসিতে। বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ পড়ে। রব ওঠে, পালাও, পালাও।'

মানুষ পালাতে থাকে। ভয়ার্ত পশুগুলো ঊর্ধ্ব-শ্বাসে, ছোটে। 'হাম্বা, হাম্বা' রবে গাই ডাকতে থাকে তার বাছুরকে। বাছুর গাইকে। 'ব্যা-ব্যা' শব্দে ভেড়াগুলো ডাকে। হাঁসগুলো প্যাঁক-প্যাঁক' করে জল থেকে উঠে পড়ে। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দে বুনো শুয়োরের দল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে। 'গরুর গরুর' করতে করতে লোমশ ভালুকের দল দৌড়য় তাদের গুহার দিকে। 'টিউ টুউ' ডাকে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছোটে হরিণের পাল। ভয় পেয়ে ব্যাঙগুলোও ডাকতে থাকে 'ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ'! কীটপতঙ্গ মাটিতে লুকোয়। ভয়ার্ত পাখিগুলো গাছের ডালে বসে কলরব করতে থাকে।

ঠাকুর তাদের দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করেন। দিগন্ত কাঁপিয়ে শব্দ ওঠে, 'কড়-কড়-কড়াৎ!'

পৃথিবীর পাপী তাপীদের উপর এসে পড়ে তাঁর সেই অগ্নি কটাক্ষ। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে পালাতে গিয়ে আগুনে ঝলসে খায়। পুড়ে মরে হরিণের পাল, বুনো শুয়োর আর লোমশ ভালুকের দল।

ঠাকুর তাঁর দন্ড দিয়ে মেঘের গায়ে আঘাত করেন। আকাশ যেন ফেটে পড়ে। আগুন ঝলসায়। একটার পর একটা জ্বলন্ত গাছ ভেঙ্গে নুয়ে পড়ে।

তারপর মুষলধারায় নামে বৃষ্টি। আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের চমক ও বাজের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা যেন চিৎকার করতে করতে ছুটে যায়। বৃষ্টিতে চারিদিক ঝাপসা হয়ে আসে।

ঝমু-ঝমু শব্দে সেই যে নামে বৃষ্টি, চলে তা সারা দিন। সারা রাত। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে গাছ। দেখতে দেখতে সব জলে ভেসে যায়। ডুবে যায়, মাঠ-বন-পাহাড়।

ঝড়ের উত্তাল বাতাসে তারপর ফুলে ফেঁপে ওঠে সমুদ্র। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে পাড়ে।

সেই সঙ্গে ঝড়ের গর্জন। মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গের আতঙ্কের চিৎকার ডুবে যায় তার শব্দে।

হারাতো পাহাড়ের গুহায় পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুঢি তখন উবু হয়ে ঠাকুরকে ডাকছে, 'গড় করি গড় করি তোর পায়ে, ঠাকুর! এমন 'পেলয়' করছিস কেন? কি হবে? কি করবি তুই? তোর 'বজ্জ'কে তুই থামা।' 'বজ্জ' গড় করি তোর পায়ে। তুই থাম!'

গুহার বাইরে ঝড় আর বৃষ্টির শব্দে তাদের সব কথা ডুবে যায়। সাত দিন সাত রাত ধরে চলে সেই ঝড় আর বৃষ্টি। ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি। বাতাসের গোঁ-গোঁ গর্জন। তার ছেদ নেই, বিরাম নেই। একটানা চলেছে তো চলেছেই!

সাত দিন এমনি ধারায় চলার পর বাতাসের গতি থেমে আসে। সেই গোঁ গোঁ গর্জন আর নেই। কানে আসে শুধু বাতাসের গোঙানির শব্দ। খেয়ালী ঝড় আপন খেয়ালেই থেমে যায়। বৃষ্টিটাও যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর ভাঙ্গা মেঘের ফাঁকে আকাশের এক কোণে লজ্জার মত একটুখানি রঙের আভাস দেখা দেয়। পাহাড়ের মাথা থেকে মেঘের জাল সরিয়ে হেসে ওঠে সূর্য। সুন্দর সোনালী রোদের আলো গুহার মধ্যে শান্ত ভালবাসার মত ছড়িয়ে পড়ে।

ঝড়-বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ তখন শান্ত। বুড়া-বুড়ি তাদের গুহার বাইরে এসে দাঁড়ায়। একি! যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। থৈ-থৈ জল। গাছপালা ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে মানুষ, জীব-জন্তু, কীটপতঙ্গ ও আরও কত কি!

জল একটু কমতেই দেখা যায়, চারিদিকে মরে পড়ে আছে কত মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ। গোড়া উপড়ে ডাল ভেঙ্গে পড়ে আছে গাছপালা। এলিয়ে পড়ে আছে মরা ঘাস। গাছের ভাঙ্গাচোরা ডাল-লতা-পাতায় মরে লেপ্টে আছে কত পতঙ্গ। পাপী তো শুধু মানুষই নয়। সকলেই যে পাপী! আকাশে কোথাও আর একটা পাখি নেই, মাটিতে একটা মানুষ নেই, জীবজন্তু নেই, একটা পতঙ্গের আওয়াজও শোনা যায় না। বুড়ো-বুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই পৃথিবীতে। কেউ নেই, কেউ নেই। কি ভয়ানক নিরালা পৃথিবী।

গুহার সামনে এসে ঠাকুরজীউ তখন পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুঢিকে ডাকেন। বলেন, 'যা, পৃথিবীতে গিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধ তোরা!'

বুড়ো-বুড়ি তখন নেমে আসে পাহাড় থেকে। চারিদিক কি শান্ত! পৃথিবীর সব কিছুই যেন নতুন। আকাশে নতুন দিনের নতুন রোদ। নিচে প্রান্তর ছেয়ে গেছে নতুন ঘাসে। কোথাও আর কোন ক্ষোভের চিহ্ন নেই।

সেই পাহাড়ের নিচে ঘর বাঁধে তারা। সেখানেই বাস করতে থাকে।

কালে তাদের ছেলেমেয়ে হয়। তারপর সেই ছেলেমেয়েদেরও ছেলেমেয়ে। সুখে বসে করতে থাকে তারা। এখনও করছে।




মাণিকদা, ফুংপিয়াও এবং আমরা

শ্রীসুপ্রিয় বাগচী

সেদিন সকাল থেকেই আকাশটা মুখ গুমরে থাকায় সন্ধ্যেবেলায় আমাদের আড্ডাটা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। চা, তেলেভাজা ইত্যাদি সহযোগে যখন আমরা কোনো এক নতুন স্বাদের অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, প্রায় ঠিক সে সময়েই দরজা ঠেলে মাণিকদা ঘরে ঢুকলেন। আমরা প্রায় সমস্বরে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলাম। মাণিকদা বর্ষাতি খুলে একপাশে রাখলেন। স্বভাবসিদ্ধ মুখ-ভেংচি করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফুং-পিয়াও-এর মতো চীৎকার করছিস্ কেন? যত্তো সব!'

'ফুংপিয়াও! সে আবার কে? আমরা আকাশ থেকে পড়লাম।

মাণিকদা ধীরে সুস্থে বসলেন, বললেন, 'যখন আমি চীনে ছিলাম, তখন এই ফুংপিয়াওই ছিল আমার সর্বস্ব। একাধারে বন্ধু, পথপ্রদর্শক এমনকি অভিভাবক।'

মাণিকদা আবার চীনে কবে গেলেন? আমরা কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। কিন্তু মাণিকদা সে বিস্ময় আর রাখলেন না চায়ের ফরমাশ দিয়ে বললেন, 'তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। আমি তখন উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। সেই সময়েই আমার সাথে ফুংপিয়াও-এর আবার দেখা।

মাণিকদা থামলেন। চা এল। আমরা দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলাম। মাণিকদা কখনও যুদ্ধে গিয়েছিলেন, এ তথ্য আমাদের জানা ছিল না। যাই হোক মাণিকদার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল।

আমি ছিলাম সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ। কাজকর্ম তদারক আমাকেই করতে হতো। তারই মাঝে মাঝে একটু এদিক ওদিক ঘুরতাম। যদি আর দেশে ফিরতে না পারি তবুও এই ঘাস, বন জঙ্গল এরই মাঝে আমার সোনার বাংলার কিছুটা তো আমেজ পাব।

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর চলে গিয়েছিলাম। ফিরবার সময় দেখি আবছা সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সূর্য কাত হয়ে হেলে দূরের পাহাড়ের কোণা দিয়ে আমাকে সেলাম জানাচ্ছে। বেশ আমেজ লাগছিল। ভাল লাগছিল এই সুন্দর আলোছায়ার খেলাকে কিন্তু সাড়ে ছটার ভেতর ফিরতেই হবে। হাতের ঘড়ির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দ্রুত পা চালাতে যাব, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন পরিষ্কার বাংলায় বললো— 'বাবু কেমন আছেন?

চমকে পেছন ফিরলাম। একজন মধ্যবয়স্ক চীনাম্যান।

চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে। বাংলায় আমি বললাম—'ঠিক তো চিনতে পারলাম না।' চীনে-ম্যানটি হাসলো। 'আমার নাম ফুংপিয়াও। যখন কোলকাতায় ছিলাম তখন আপনার জুতার কোম্পানিতে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে চাকরি করতাম।' এবার খেয়াল হল। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে আমার বিরাট জুতার কোম্পানি ছিল। ফুংপিয়াওকে সেখানেই দেখেছি বটে।

আমরা গল্প শুনছিলাম। শঙ্কর বোধ হয় বিষম খেল। কেননা বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে মাণিকদার জুতার কোম্পানি?.......যাক সে কথা...

মাণিকদা আবার শুরু করলেন—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখানে কি করছো?' ফুংপিয়াও একটু হাসলো। তারপর মুখ নীচু করে বললো— 'সে অনেক কথা বাবু, সময় হলে জানাব।'

কেমন যেন রহস্যের ইঙ্গিত পেলাম ওর কথায়। বললাম, 'এসো না আমার সঙ্গে ক্যাম্পে। কেউ নেই, কফি খেতে খেতে কথা হবে।'

ও আমার সঙ্গে এল। ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে কফি তৈরী করতে করতে বললাম, 'বলো তোমার কথা।'

ফুংপিয়াও এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বললো, 'আমি এক গুপ্তধনের সন্ধানে বেরিয়েছি।'

গুপ্তধন! এখন তো আষাঢ় মাস নয়। নিজের মনেই বললাম।

ফুংপিয়াও বলে চললো—

'আমি তখন কলকাতায় থাকতাম। সেদিন সন্ধ্যেবেলা কার্ফুর অর্ডার হলে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছিলুম। টেরিটি বাজারের কাছাকাছি প্রায় এসেছি, এমন সময় ধাঁ করে একটা সার্জেন্টের গাড়ি আমার সামনে এসে থামলো। আমি কোন কথা বলার আগেই আমার দিকে বন্দুকের নল উঁচু করে বললো, 'কাঁহা যাতা মালুম নেহি? কার্ফু হ্যায়।... আমি কোনো রকমে ওকে সব গুছিয়ে বলতে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরে আবার কোম্পানীর দিকে পা চালালাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আপনি যে ঘরে বসতেন তালা খুলে সেই ঢুকলাম। ভাবলাম রাতটা এখানেই কাটাই। হঠাৎ দেখলাম, টেবিলের ওপর একটা চিঠি। লাল খামের ওপরে ড্রাগনের ছাপ দেওয়া।

ড্রাগন দেখেই আমার চিঠিটা খুলে পড়তে ইচ্ছে করল। ভুলে গেলাম এটা আপনার চিঠি। আপনাকে না জানিয়ে খামটা খুলে পড়লাম। সুদূর তিব্বত থেকে লেখা। সেখানকার এক বৌদ্ধমঠ থেকে আপনাকে লিখেছেন সেখানকার মঠাধ্যক্ষ। বলেছেন আপনি যেন দেখা করেন তাড়াতাড়ি। তিনি মৃত্যু-শয্যায়। বহুদিন আগে তাকে একবার আপনি নেকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিলেন, সেই কৃতজ্ঞতার জন্য আপনাকে ভোলেন নি। তাই মৃত্যুকালে আপনাকে এক গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে যেতে চান।

ফুংপিয়াও দম নিল। আমি ততক্ষণে কফি তৈরী করে নিজের কাপে চুমুক দিয়েছি আর ওরটায় ব্ল্যাক চিনি না দিয়ে একটু অল্প করে আফিং মিশিয়ে ওর হাতে দিয়েছি। রুদ্ধশ্বাসে বললাম—তারপর?

ফুংপিয়াও কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, চিঠিটা পড়ে আমার মাথা ঘুরে গেল। চিঠিটা পকেটে পুরে কোনোরকমে রাতটা কাটিয়ে আপনাকে না জানিয়ে পরের দিন পালালাম। আপনি কিছু জানতে পারলেন না।

তারপর সেই এক ইতিহাস। কত নদী, প্রান্তর পেরিয়ে সেই সুদূর তিব্বতে যখন পেঁছালাম, তখন সে মঠের অধ্যক্ষ প্রায় মৃত্যুমুখে। আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তখন বাবু আমি সব কথা স্বীকার করলাম। সেই মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে মিথ্যে কথা বলতে আমার গলা বুজে আসছিল। তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। তিনি বললেন, তথাগত বুদ্ধ তোমার কল্যাণ করুন। অনুতাপই মানুষকে শুদ্ধ করে। এই বলে তিনি বালিশের তলা থেকে হাতে আঁকা একটা ম্যাপ দিয়ে বললেন, মাণিকবাবুর সন্ধান করে তার হাতে পেঁছে দিও। তোমায় বিশ্বাস করে দিয়ে গেলাম। এই বলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এরপর কলকাতায় ফিরে আসি। শুনলাম জুতার কারখানা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। আপনার বাড়ি গিয়ে শুনলাম সৈন্যদলে যোগ দিয়ে আপনি নাকি সুদূর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রয়েছেন। তাই বহুকষ্টে খোঁজখবর নিয়ে এখানে এসে পেঁছেছি। এই নিন আপনার সেই মানচিত্র। এই বলে ফুংপিয়াও তার কামিজের তলা থেকে ভাঁজ-করা একটা কাগজের ওপর হাতে আঁকা মানচিত্র আমার হাতে তুলে দিলে।

আমি এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে ওর কাহিনী শুনছিলাম। ফুংপিয়াওর সত্যবাদিতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ম্যাপটা ওর হাতে ফেরৎ দিয়ে বললাম, এটা আমি তোমাকেই দিলাম। তোমার কর্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কার। ফুংপিয়াও হঠাৎ তোদের মতো চীৎকার করে উঠল— বুদ্ধ আপনার মঙ্গল করুন, আমাকে শান্তি দিন।

আমরা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলাম। কিন্তু শেষকালে আর থাকতে না পেরে সমীর তার স্বভাব-সিদ্ধ বাচনভঙ্গীতে মাণিকদার দিকে তাকিয়ে বলল, সবই না হয় হল কিন্তু গল্পের প্রথমে আপনি বলেছিলেন যে আপনি যখন চীনে ছিলেন তখন এই ফুংপিয়াওই ছিল একাধারে আপনার বন্ধু, পথপ্রদর্শক এমনকি অভিভাবক। কিন্তু চীনে তো আপনি যান

নি কেননা ঘটনার কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, আর সেই ম্যাপ প্রত্যর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই যখন যবনিকা, তখন ফুংপিয়াও কিভাবে আপনার বন্ধু, পথপ্রদর্শক এবং অভিভাবক ?

মাণিকদা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'খুব চালাক হয়েছিস, আর এককাপ চায়ের অর্ডার দে। গলা শুকিয়ে গেছে।'

আমরা পরস্পর চোখ চাওয়া-চায়ি করে বৃথা বাক্য-ব্যয় না করে মাণিকদার জন্যে আর এককাপ চায়ের অর্ডার দিলাম।

দেশপ্রিয়

বিদ্যুৎ ভৌমিক

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাস্টারমশাই পড়াতে এসেছেন কিন্তু ছাত্রের দেখা সাক্ষাৎ নেই। মাস্টারমশাই বাড়ীর চাকরকে সামনে পেয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—'খোকা কই ? চাকর বলল—'দাদাবাবু খেলতে গেছেন। আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।' চাকর ডাকতে গেল।

মাস্টারমশাই বসে আছেন। পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট—পনেরো মিনিট কেটে গেল ছাত্রের দেখা নেই। গৃহকর্তা মাস্টারমশাইকে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'খোকা এখনো পড়তে আসেনি, মাস্টার-মশাই ?' মাস্টারমশাই শুধু বললেন—'না'। গৃহকর্তা রেগে গিয়ে ডাকতে লাগলেন—'খোকা! খোকা !!

পিতার ডাক শুনে খোকা ত্রস্তপদে পড়ার ঘরে ঢুকলো। মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন—'এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?' ছাত্রের উত্তর—'ক্রিকেট খেলছিলাম, আমি না থাকলে বল দেবে কে ? জানেন, তিনটে বলে তিনজনকে আউট করে দিয়েছি। ওদের সব জারি-জুরি ভেঙ্গে দিয়েছি।'

মাস্টারমশাই রাগের সঙ্গে বললেন—'বেশ করেছ। এখন অঙ্কের খাতা নিয়ে অঙ্কগুলো কষে নাও, তারপর…।' ছাত্রটি মৃদুস্বরে বলল—'আগে অঙ্ক কেন, স্যার, আগে ইতিহাস পড়ে নিই।'

মাস্টার মশাই কড়া শাসন করলেন—'না, আগে অঙ্ক কষ।'

'কিন্তু স্যার, অঙ্ক কষতে এখন ইচ্ছে করছে না, আগে ইতিহাস পড়া করে নিই, তারপর…'

—ছাত্রের জবাব। মাস্টারমশাই আবার ধমকালেন —না, আগে অঙ্ক কষ, কদিন ধরে অঙ্ক ভাল কষাই হচ্ছে না, শেষে অঙ্কে ফেল করবে যে!

সে সব ঠিক হয়ে যাবে—সহজভাবে ছাত্রটি বলল। মাস্টারমশাই বিরক্তি নিয়ে বললেন—তাহলে তুমি ভাল করে অঙ্ক শিখবে না ঠিক করেছ, আমি তোমার বাবাকে বলে দিচ্ছি। ছাত্রটি অনুনয় করে বলল—না, না। বাবাকে কিছু বলবেন না, আমি অঙ্ক কষছি। ছাত্রটি অঙ্ক কষতে লাগল। মাস্টারমশাই মৃদু হাসলেন।

এই পিতৃশাসনভীত অঙ্কে বিরূপ সাধারণ ছেলেটিই পরবর্তী জীবনে ত্যাগ সেবার আদর্শ, সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতার ব্রত নিয়ে অসাধরণ হয়ে উঠেছিলেন।

ইনি কে জানো ? ইনি হলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর ইনিই বাংলার মুকুটহীন রাজা ছিলেন। তোমরা ত্যাগ, নিষ্ঠা, নির্ভীকতার ব্রত নিয়ে অনন্যসাধারণ হতে শেখো।

সিমলাপুরের রূপকথা

নীল মুখার্জ্জি

সিমলাপুরের গ্রামে এক কিপটে ব্রাহ্মণ বাস করত। তার ছিল একটা পা খোঁড়া। ব্রাহ্মণের ছিল দুই ছেলে মেয়ে আর তার ব্রাহ্মণী। ছেলে মেয়ে দুটো যেন হাড় জিরজিরে, আর ব্রাহ্মণী? তার তো বলতে গেলে ছেলেমেয়েদের থেকেও খারাপ অবস্থা।

ব্রাহ্মণের কোন না কোন পুজোর ডাক গ্রাম থেকে প্রায়ই আসে। পুজো করে চাল-কলা, ফলমূল যা পাবে তা আর কিছু দিয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আর ছেলে-মেয়ে ভাগ করে খায়। তা বলে তোমরা মনে করো না ব্রাহ্মণের কোন টাকা-পয়সা নেই, আছে প্রচুর অর্থ কিন্তু সবেরমূলেই ওই কিপটেমি। পুজো সেরে এসে প্রতিদিন একবার করে সিন্দুক খোলা চাই-ই-চাই ব্রাহ্মণের।

ব্রাহ্মণের অর্থ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তার বাড়িতে কিছুতেই শান্তি নেই। একবার ব্রাহ্মণের ছেলে বল্টুর ম্যালেরিয়া হল। ব্রাহ্মণ তো প্রথমে এটা, ওটা, পাঁচন খাওয়াতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই আর কমে না বল্টুর ম্যালেরিয়া। দিন যায় অসুখ বাড়ে। ব্রাহ্মণী কত করে বলল ব্রাহ্মণকে যে, বল্টুর ম্যালেরিয়া ডাক্তার বা কবিরেজ না দেখালে সারবে না। কিন্তু ওই যে কিপটেমি—টাকা খরচ করব, থাক্ না টাকা, খরচ করার দরকার কী? অসুখ সারবেখন।

ব্রাহ্মণের বাড়িতে একদম শান্তি নেই বলে ব্রাহ্মণ বেরিয়ে পড়ল সাধুসঙ্গ নিতে। রাস্তায় যেতে-যেতে হাঁটতে-হাঁটতে খোঁড়া পায়ে এগিয়ে চলল। ক্রমশ দিগন্তের শেষ আলোটুকু নিভে গেল।

ব্রাহ্মণ সন্ধ্যের হাল্কা অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলেছে সাধুসঙ্গ নিতে। সিমলাপুর ছাড়িয়ে দক্ষিণপাড়া, তারপর সপ্তর্ষিপাড়া, তাও গেল, গোয়াল-পাড়া, বেলাপুর, অচিনপুর এসব ছাড়িয়ে ব্রাহ্মণ এগিয়ে চলেছে। চলছে, চলছে আর চলছে। হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ব্রাহ্মণ আলোর মুখ দেখতে পেল। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে এসে দেখতে পেল এক গাছের তলায় বিরাট প্রকাণ্ড জটা মাথায় করে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ ধ্যানস্থ অবস্থায়। তাঁর কপালে এক বিরাট লাল টকটকে টিপ, বিশালকায় চেহারা, সামনে জ্বলন্ত ধুনি।

সাধু ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। সিমলাপুরের খোঁড়া ব্রাহ্মণ বুঝল তার এখানে আসা সার্থক হয়েছে। সিমলাপুরের ব্রাহ্মণ হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে সাধুর পা জড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

সাধু হঠাৎ ধ্যানস্থ অবস্থায় বললেন—"তারা! তারা! মা আয় আয়।" গলার আওয়াজ যেন রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে সারা গ্রাম কাঁপিয়ে তুলল।

সাধু হঠাৎ উতলা হয়ে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে, তোর আবার কী হলো"? ব্রাহ্মণ পা-ধরা অবস্থায় বলল, "বাবা আমার অর্থ আছে কিন্তু কোন শান্তি নেই"। "ওঠ, ওঠ"—সাধুর উক্তি। ব্রাহ্মণ পা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠল। সাধু এক বিরাট ঝোলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা আমের আঁটি বের করলেন, "এই নে ব্রাহ্মণ, তুই ভগবানকে ছাড়া যা চাইবি তাই-ই পাবি, আর কিপটেমি একদম করবি না। আর শোন্ প্রত্যেক দিন ভোরবেলায় আমার নাম করবি"।

ব্রাহ্মণের সেকি আনন্দ, উল্লাস, হর্ষ। সারা অন্ধকারময় গ্রামকে যেন একাই দিন করে ফেললো। ব্রাহ্মণ প্রথমেই আমের আঁটিকে বলল, "আমার খোঁড়া পা ভাল হয়ে যাক"। ঠিক তাই, মুহূর্তের মধ্যে খোঁড়া পা ঠিক হয়ে গেল। ব্রাহ্মণকে তখন আর পায় কে। রাত্রির অন্ধকারে আর হাঁটা যায় না, কি করা যায়? ব্রাহ্মণের মাথায় বুদ্ধি এল, সঙ্গে সঙ্গে আমের আঁটিকে বলল, "আমার একটা ঘোড়া চাই"। আশ্চর্যের ব্যাপার ঠিক তাই একটা ফুটফুটে সাদা ঘোড়া চলে এল।

ঘন রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে চললো মাত্র দুটো প্রাণী, ব্রাহ্মণ আর ঘোড়া। প্রায় ভোর হয়ে উঠেছে। সূর্যদেব উদয়োন্মুখ। ব্রাহ্মণ মুহূর্তের মধ্যে তার বাড়িতে পেঁছে গেল।

বাড়িতে ঢুকেই ব্রাহ্মণ কাউকে কিছু না বলে সোজা চলে এল যে ঘরে সিন্দুক ছিল সেই ঘরে, এসেই ব্রাহ্মণ আমের আঁটিকে যত্নসহকারে সিন্দুকে রেখে দিল। এবার এসে ব্রাহ্মণ সব খবর যা যা ঘটেছে বলল, ব্রাহ্মণী ও তার ছেলেমেয়ে ভাবল এবার আর আমাদের কোনও দুঃখ থাকবে না। বেশ মজা হবে যখন যা দরকার তাই ই পাব।

ভোর হয়েছে একটু আগেই ব্রাহ্মণের মনে পড়ল এখন সাধুবাবার নাম করতে হবে। এই-ই য্যা, সব থেকে বড় ভুল সে করেছে। কী করেছে, শুনবে? সাধুবাবার নাম ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করে আসেনি। ব্রাহ্মণ এখন কী করে সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুক খুলে আমের আঁঠি বের করে বলল—"কাল রাত্রে আমার সঙ্গে যে সাধু-বাবার সাক্ষাৎ হয়েছিল তাকে চাই"। কিন্তু কোন ফলই হল না কারণ ভগবানকে ছাড়া আর সবই পাওয়া যাবে। সাধুবাবা এক বিরাট যোগী মহাপুরুষ কাজেই সেও একজন ভগবান।

ব্রাহ্মণ হঠাৎ দেখতে পেল এক জ্যোতি। তারপরেই দেখতে পেল সেই সাধুবাবাকে, হঠাৎ সাধুবাবা বলে উঠল, "ব্রাহ্মণ তুই পুনরায় আমার দেখা পেলি কারণ পূর্বজন্মে তুই অনেক পুণ্য করেছিলি। শোন্ আমার নাম চিত্রানন্দ, বুঝলি"? "হ্যাঁ, গুরুদেব" ব্রাহ্মণের উক্তি। "আর শোন্ আজ থেকে দান ধ্যান আর সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর্, কারণ ব্যবহারটাই সব থেকে বড় এবং মূল্যবান জিনিস"। এই বলে চিত্রানন্দ চলে গেলেন।

এরপর বহুদিন কেটে গেল ব্রাহ্মণ আর কিপটেমি করে না। ব্রাহ্মণ সবসময় মন্দিরে বসে দান, ধ্যান ও মিষ্টি বাক্যালাপ করেই কাটায়। বাড়িতে সবাই সুখে আছে। ব্রাহ্মণেরও মনটা ঠাণ্ডা হয়েছে। ছেলে বল্টুও অনেক বড় হয়েছে, চাকরি পেয়েছে। ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সেও সুখেই আছে।



সাধুর সামনে ব্রাহ্মণ

গ্রামের লোক এখন ব্রাহ্মণকে "গুরুদেব" এবং ব্রাহ্মণীকে "গুরুমা" বলে ডাকছে। গ্রামের সবার ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর ফটো আছে, তাদের পুজো করে। এখন ব্রাহ্মণের সব আছে কাজেই আমের আঁটিকে আর বিরক্ত করে না। ব্রাহ্মণ মনে করে, আমের আঁটির ভেতর প্রাণ আছে।

ব্রাহ্মণের সিন্দুকের টাকা দিয়ে গ্রামে টোল, স্কুল, সরাইখানা রাস্তা-ঘাট সব হয়েছে।

টুটু সোনা

(রূপকথা)

নির্মলকান্তি ঘোষ

অবন্তীপুরের মহারাজের চোখে ঘুম নেই। সারা রাত তিনি একরকম জেগেই কাটান। চোখের সামনে ভোর হয়ে আসে, তবু তিনি দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন না। অথচ ঘুমে তাঁর দু'চোখ ভেঙে আসে। চোখ বুজলেই তিনি আরো বেশী যন্ত্রণা পান।

মহারাজের কষ্টের কারণ আছে। পর পর দু' বছর খরায় দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ হতে চলেছে। সেই সঙ্গে আছে দৈত্যদের উৎপাত। কেউ বলে, দৈত্য তার ছেলে নিয়ে পালিয়েছে। আবার কেউ জানায় দৈত্য তার মেয়ে নিয়ে উধাও। এইসব বলে প্রজারা প্রায়ই কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে ছুটে আসে, মহারাজ! আমাদের বাঁচান।

মহারাজ কিছু করতে পারেন না। শুধু অসহায় ভাবে প্রজাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। প্রজারা মহারাজের অবস্থা হয়তো বুঝতে পারে। তারপর তারা আর কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে চলে যায়। এতে মহারাজ আরো কষ্ট পান। প্রজারা তাঁর পুত্রের সমান। অথচ ওদের এত বড় বিপদের দিনে তিনি কিছুই করতে পারছেন না। এর চেয়ে দুঃখের আর কী থাকতে পারে।

যখন রাজ্যের এই অবস্থা তখন একদিন মন্ত্রী মহারাজকে অভিবাদন করে জানালেন, মহারাজ, প্রজাদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। পবনপুরের একজন প্রজা বলে বেড়াচ্ছে, তার মেয়ে একদিনের মধ্যে সারা রাজ্য ফসলে ভরিয়ে তুলতে পারে এবং তার মেয়ের আরো অনেক গুণ আছে। গান গাইতে পারে, নাচতে জানে ইত্যাদি।

যদিও অবাস্তব তবুও ফসলের কথা শুনে মহারাজ আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, মন্ত্রী, এ কী কখনও সম্ভব? একটা মেয়ে ভোজবাজীর মতো রাতারাতি সারা দেশ ফসলে ভরিয়ে তুলতে পারে?

—তা তো ঠিকই, তবু মহারাজ, প্রজাদের মুখ বন্ধ করার জন্য অন্তত আপনাকে কিছু একটা ব্যবস্থা নিতেই হবে, মন্ত্রী বলে। নইলে ওরা রোজ আমার কাছে এসে বিক্ষোভ জানাচ্ছে, তাতে একটা অঘটন ঘটতে পারে।

—দোষ ওদের আর কী দেবো বলো! মহারাজের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। ঠিক আছে, পাইক বরকন্দাজ পাঠিয়ে মেয়েটিকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।

তারপর মন্ত্রী মহারাজের নির্দেশ পেয়ে টুটুকে ধরে নিয়ে আসেন। মহারাজ তো টুটুকে দেখে অবাক। টুটুর বয়স নয় দশ হবে। ফুটফুটে পরীর মতো দেখতে। প্রজার মেয়ে বলে তাকে মনেই হয় না। মনে হয় সে কোন এক দেশের রাজকন্যা।

টুটুর পরনে মলিন বেশ। খালি পা। একরাশ কালো চুল তার সারা পিঠময় ছড়িয়ে রয়েছে।

টুটুকে এভাবে এখানে ধরে আনার জন্য সে মনে মনে খুবই বিরক্ত, আর রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য দেখে সে মুগ্ধ। কারণ জীবনে সে তো কখনও রাজপ্রাসাদ দেখে নি। শুধু ঠাকুরমার কাছে সে শুনেছে রাজা, রাণী, রাজকুমার, রাজকন্যারা সব রাজপ্রাসাদে থাকে। তাই এখন রাজপ্রাসাদ দেখে যেন তার কিছুতেই আশ মিটছে না।

টুটুকে দেখে মহারাজের ফসলের কথা মনে পড়ে যায়। তাই তিনি টুটুকে কাছে ডেকে আদর করে

বলেন, টুটু সোনা, তুমি নাকি সারা রাজ্যে ফসল ফলিয়ে দিতে পারো ?

—তোমায় একথা কে বললো ? টুটু মহারাজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে হাসে। নিশ্চয়ই বাবা বলেছে। আসলে আমি মা-মরা মেয়ে বলে বাবা আমাকে খুশী করার জন্য এসব কথা বলে বেড়ায়। তাই হয়তো কোন প্রজা এসে তোমায় একথা জানিয়েছে।

একথা শুনে মহারাজ মন্ত্রীর দিকে তাকালেন। অর্থাৎ টুটুকে এখানে শুধু শুধু ধরে রেখে লাভ কি ! অভিজ্ঞ মন্ত্রী তা বুঝতে পেরে মহারাজকে বললেন, মহারাজ, প্রজাদের মুখ বন্ধ করার জন্য অন্তত কিছু দিনের জন্য টুটুকে এখানে রেখে দেওয়া প্রয়োজন। তারপর নয়, ছেড়ে দেওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন পার হয়ে গেছে। একদিন টুটু সোনার পালঙ্কে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ মাঝ রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। কে যেন তাকে ঠেলছে। সে চোখ খুলে দেখে, তার সামনে এক বিরাট দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে।

টুটু প্রথমটা ভয় পেয়ে গেলেও পরে যখন দৈত্য কোন দুষ্টুমি করে নি তখন দৈত্য নিশ্চয়ই তাকে কোনরকম শাস্তি দেবে না। তবু দৈত্য দেখলে কার না ভয় করে। তার উপর দৈত্য যা চারদিকে উৎপাত করছে।

দৈত্য টুটুর দিকে তাকিয়ে হুংকার ছাড়ে, টুটু, আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

তবু টুটু সাহস সঞ্চার করে জানতে চায়, কেন ? তারপরই সে ভাবে, রাজকুমার তার বন্ধু। রাজ-



টুটু সোনার পালঙ্কের ধারে দৈত্য

মহারাজ সায় জানাতে টুটুর রাজপ্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা হলো। দাস দাসী টুটুর সেবা যত্নে ব্যস্ত। হোক না সে একজন প্রজার মেয়ে, তার রূপই যেন তাকে সে অধিকার দিয়েছে। রাজকুমার তার সঙ্গে খেলা করে। তাতে তার বেশ আনন্দ হয়। তবু তার বাবার কথা এক এক সময় মনে হয়। সে চিন্তা সে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না। কারণ সে রান্না করে দিলে তবে তার বাবা খায়। বাবা আবার ইদানিং চোখেও কম দেখে।

কুমারকে এখনই ডেকে আনলে দৈত্যকে তলোয়ারের ঘায়ে দু'খণ্ড করে ফেলবে।

—তোমার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেবো।

এ কথা শুনে হঠাৎ টুটুর একটা কথা মনে পড়ে যায়। বলে, আমি রাজী। তবে আমার একটা শর্ত আছে।

—তোমার শর্ত আছে ? দৈত্য হাসে। বলো, তোমার কী শর্ত ?

—এই রাজ্য তোমায় ফসলে ভরিয়ে তুলতে হবে, তবেই আমি রাজী।

—এ আর এমন শক্ত কাজ কী! দৈত্য জানায়। তুমি কাল সকালে উঠে দেখবে সারা রাজ্যের ক্ষেত ফসলে পূর্ণ। আর আমি কাল রাতে এসে তোমায় নিয়ে যাবো। তুমি তৈরী থেকো।

টুটু ভাবে, রাজ্য ফসলে পরিপূর্ণ হলে তখন সবাই খুশী হবে এবং দৈত্য কখন আসবে তা জানতে পারলে রাজকুমারই দৈত্যকে এক তরোয়ালের ঘায়ে অথবা তীর-ধনুক দিয়ে মেরে ফেলবে। তারপর টুটু হাসিমুখে দৈত্যকে সায় জানাতে দৈত্য বড় বড় পা ফেলে পাহাড়ের চূড়োর দিকে চলে যায়।

তারপরের দিন ভোর হতে না হতেই সারা রাজ্যে হৈ-চৈ পড়ে যায়। মহারাজ, মন্ত্রী, রাজকুমার ইত্যাদি সবাই ছুটে এসে টুটুর কাছে সব শুনে তাকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করে দেয়, কিন্তু টুটু খুশীর জোয়ারে তাদের দৈত্যর কথাই জানাতে একেবারে ভুলে যায়।

তারপর রাত্রি ঘনিয়ে আসে। টুটু মাঝ রাতে স্বপ্ন দেখে, তার মা তাকে বলছে, টুটু, একটু পরে দৈত্য তোর কাছে আসবে, আর তুই কিনা এখনো পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছিস! শিগগির ওঠ্। আর শোন্, রাজ-প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ডান দিকে যে একটা মজা পুকুর আছে, সেখানে একটা বড় রুই মাছ আছে। সেই মাছটা মেরে ফেলতে পারলেই দৈত্যগুলো সব মরে যাবে। ঐ মাছের মধ্যেই ওদের সবার প্রাণ রয়েছে।

টুটু জানে, ঐ পুকুরপাড়ে একটা বুড়ী থাকে। ঐ গরীব বুড়ীকে সে রোজ খাবার খেতে দেয়। তাতে বুড়ী খুশী হয়ে তাকে পরশু বলেছিল, টুটু সোনা, আমার এগারো ছেলে আছে। তোমার কোন দরকার হলে আমায় জানাবে।

টুটু ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে। তারপর সে প্রহরীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে নির্দিষ্ট পুকুরপাড়ে ছুটে যায় এবং শুয়ে থাকা বুড়ীকে জাগিয়ে তাকে সব বলে।

—তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, বলে বুড়ী লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আমি এখনই এগারো ছেলেকে ডেকে রুই মাছটাকে ধরাচ্ছি। আর মজা পুকুরে মাছ ধরতে কতক্ষণ। আর ঘরেও একটা বড় জাল আছে।

সারা রাজ্য জুড়ে খরা। ফলে পুকুরে জল কম। তাই একটু চেষ্টা করতেই রুই মাছটা ধরে মেরে ফেললো, আর ঠিক তখনই বিকট চীৎকারে ছুটে আসা দৈত্যগুলো যে যেখানে ছিল সেখানেই মরে পড়ে রইলো।

সাংঘাতিক চীৎকারে রাজ্যের সবার ঘুম ভেঙে যায়। তারপর সকলে ছুটে এসে টুটুর মুখে সব শুনে তাকে ধন্য ধন্য করতে থাকে। টুটুর জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। আর টুটুকে তার বাবার কথা বলতে হলো না। মহারাজের আদেশে টুটুর বাবা চিরতরের জন্য রাজ-অতিথি হলো।

ওদিকে রাজ্যে সাতদিন ধরে উৎসব চলতে লাগলো এবং মহারাজ খুশী হয়ে টুটুর সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে দিলেন। আর উৎসব শেষে টুটু সবাইকে মোহর বিলোতে লাগলো?

সারা রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে আসে।

ফাল্গুনে

রথীন্দ্রনাথ রায়

শীত বুড়ীটা পালিয়ে গেলো
কালগুনে কি মন্তরে!
ফাগুন ফাগুন ফাগুন এলো
নেই যে খুশীর অন্ত রে
ডালে ডালে নতুন পাতা
আমের শাখা ভরলো বলে
মৌমাছিরা ফুলে ফুলে—
ফুলগাছ ঢের হাওয়ায় দোলে।
শিমুল বনে, পলাশ বনে,
কখন হঠাৎ লাগলো আগুন!
বনে বনে কোয়েল পাখি—
সুরবাহারে আনলো ফাগুন।

পাখি থেকে হাতী

আশাপূর্ণা দেবী



(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কতক্ষণ যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থেকেছিল জিরে তা জানে না। অনেকক্ষণ পরে যখন সাড় ফিরে এলো, তখন উঠে বসতে গিয়ে বুঝতে পারলো ওঠবার শক্তি নেই, খিদেয় হাত পা ঝিমঝিম করছে, পেটটা যেন পিঠের মধ্যে বসে যাচ্ছে।

হবে না এ রকম ? সেই যা গতকাল সকালের দিকে দিদার দেওয়া খাবার টাবার খাওয়া হয়েছিল। তারপরই মোষ পাজী দুটোর জন্যে সব লণ্ডভণ্ড। রাতে তো শুধু টুংরির মুড়ির টিন থেকে একটু একটু খাওয়া হয়েছে। প্যাণ্টের পকেটে পকেট ভর্তি টফি ছিল, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মৌরি জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, 'তোর জন্যে রাখ' বলতেও শোনে নি, সেইগুলো খুব দুঃসময়ে কাজে লেগেছে।

বনের পথে ঘুরতে ঘুরতে যখন জিভ গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল তখন মাঝে মাঝে এক একটা মুখে ফেলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়েছে। আস্তে আস্তে আবার পকেট হাতড়ালো যদি একটাও থাকে। নাঃ নেই। দু'দুটো পকেটের একটাতে একটা মাত্রও নেই।

আহা তখন যদি সবগুলো না খেয়ে ফেলতো।

অবিশ্যি টফিতে না হয় গলাই ভেজে, খিদে ভাঙে কি ?

জিরের খালি পেটের মধ্যে থেকে ডুকরে কান্না উঠে এল। এরা বোধহয় আমায় এইখানে ফেলে রেখে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবে।

কিন্তু কে এরা ?

জিরের মাথা ঝিমঝিম করলেও জিরে বুঝে ফেলল, এরা খুবই মন্দলোক। খবরের কাগজে যাদের 'সমাজ-বিরোধী মস্তান' বলে এরা তাই। ডাকাতি টাকাতি করে নির্ঘাৎ, খুন টুনও করে (সে তো বোঝাই যাচ্ছে)

আর এই ভাঙা দুর্গের মধ্যে 'আত্মগোপন' করে থাকে।

জিরের মনে হলো, ঠিক এই রকম সব গল্প যেন পড়েছে জিরে। আর সে গল্পের মধ্যে কোনো কোনো ছোট ছেলের ভীষণ দুর্গতিও দেখেছে। প্রায় মরে যাওয়া অবস্থা থেকে গোয়েন্দা বা আর কেউ উদ্ধার করেছে তাদের।

তার মানে জিরে হঠাৎ এখন একটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর নায়ক হয়ে বসেছে। কিন্তু এখন তাতে কোনো আহ্লাদ অনুভব করছে না। তার ভাগ্যে তো আর গল্পের ঘটনা ঘটবে না। এইখানেই না খেয়ে দেয়ে পড়ে মরতে হবে। পৃথিবীর কেউ জানতেও পারবে না জিরে নামের ছেলেটার শেষ দশাটা কী হলো।

আশ্চর্য! নাড়ুমামা কি একবারও এই দিকে খুঁজতে আসতে পারলো না। মা যখন শুনবে বনের মধ্যে জিরেকে ফেলে রেখে নাড়ুমামা বাড়ি ফিরে গেছে, কী বলবে মা? আর বাবা? কালিংপঙের দাদু? জীবনে কখনো আর জিরেদের শালতোড়ে আসতে দেবেন? আহা, তাহলে এখানের দাদুর মনে কী অপমান আর কষ্ট হবে?

একথা ভাবতে গিয়ে জিরে আবার উথলে কেঁদে উঠল, জিরেদের আবার আসতে না দেওয়া কি? 'জিরে' বলে কি কেউ থাকবে তখন?...

মা, আর মৌরি।

মারও কক্ষনো আর শালতোড়ে আসতে ইচ্ছে হবে না। যে দেশে এসে ছেলে হারিয়ে যায়, সেখানে আবার কোনো মা আসতে চায় না কি?

কী আশ্চর্য! পৃথিবীটা থাকবে, পৃথিবীর সবাই থাকবে। শুধু জিরে থাকবে না।

উঠতে গিয়েও উঠতে পারল না জিরে। সেই ধুলোর মধ্যেই শুয়ে পড়ল।

জিরেকে যেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওরা সেটা সিঁড়ির তলাটলা নয়। আসলে একটা গম্বুজের ভেতরটা। ছোট্ট ছোট্ট ইঁট দিয়ে গোল করে করে গেঁথে তোলা এই গম্বুজটা কম উঁচু নয়। ব্যাসও অনেকখানি। জিরে তো জিরে। একটা মস্ত লম্বা মানুষও পা ছড়িয়ে—টানটান করে শুয়ে থাকতে পারে। গম্বুজটার উঁচু দিকে একটা জায়গা ভেঙে ধসে যাওয়ার জন্যে কিছুটা আলো আসছে। অবশ্য গোল দেওয়ালের মাঝে মাঝে ফোকরও আছে জানলা-জাতীয়, কিন্তু সেগুলো ঝুল জমে জমে বন্ধ। তবে ওই ভাঙা অংশ দিয়ে কিছুটা আলো আসছে বলেই জিরে দেখতে পাচ্ছে দেয়ালের ইঁটগুলো কী ছোট্ট ছোট্ট, আর কী সুন্দর করে গোল গড়ন করে গেঁথেছে। তবু তো জিরে জানে না, সেকালে 'সীমেণ্ট' বলে কিছু ছিল না। জানলে অবাক হয়ে যেতো। ও শুধু ভাবছে সেকালে, এই পাড়া-গাঁয়ের জঙ্গলের মধ্যে এমন ভালো মিস্ত্রি এলো কোথা থেকে?

এরকম এক একটা কথা ভাবছে জিরে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। আবার যেই নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ছে। কেঁদে ফেলছে। হায়! কেন মরতে জিরে নাড়ুমামার সঙ্গে শিকারে আসবে বলে ঝুলে পড়েছিল।

জিরেকে যে গম্বুজ ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে ওরা যীশু, তপাদা আর ছেনো। সে রকম গম্বুজ এখানে আরো আছে। দু-তিনটে। একটা খুব ভাঙা ধসে পড়েছে, আর দুটো কিন্তু বেশ শক্ত পোক্ত। ওই দুটোই পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করে নিয়ে এরা বেশ বসবাস করছে। একটার মধ্যে শোয়। আর অন্যটার মধ্যে জিনিসপত্র রাখে। তা জিনিস পত্রতো নেহাৎ কমও নয়। তিন তিনটে মানুষ খায়-দায় রান্না-বান্না করে, ভাল ভাল জামা টামাও পরে। সাবান মাখে, দাড়ি কামায়, চুল আঁচড়ায়। বই পড়ে, মাঝে মাঝে খবরের কাগজও পড়ে। এসব সরঞ্জাম জোগাড়ের কোনো অসুবিধে নেই, লেগে পড়ে এই-খানেই তো পড়ে থাকে না। মাঝে মাঝে দু পাঁচদিন কি সাতদিনের জন্যে এসে বাস করে। অথবা মাঝে মাঝে দু'একদিন কাটিয়ে যায় বাকি সময়টা শহর বাজারে ঘোরে, থাকে। কাজেই যখনই আসা যাওয়া করে দরকারের মতো জিনিস এনে এনে জড় করে।...

যে ইমারতটা ভেঙে চুরে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে, তার মধ্যেও মাঝে মাঝে কোথাও আশ্চর্যজনক ভাবে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে হয় তো একখানা দেওয়াল, হয়তো একটা সিঁড়ির কতকগুলো ধাপ, হয়তো একটা খিলেন, কিন্তু অদ্ভুত রকমের আশ্চর্যজনক ব্যাপার উঠোনের মাঝখানে বিরাট একটা ইঁদারার অবস্থান। এ ইঁদারা

সেই সাবেক কালের। মনে হয় পাথরে বাঁধানো। ইয়া মোটা পুরু বিশাল লোহার চাদর দিয়ে ঢাকা, সে ঢাকা দশটা জোয়ান লোক মিলে তুলতে পারবে কিনা সন্দেহ। এতো ভালো লোহা যে মরচেও পড়ে নি। সেই ঢাকার মাঝখানে চৌকো একটা ফোকর, সেই ফোকরের মধ্যে দিয়ে বালতি নামিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা। ব্যবস্থা খুব সোজাও। ই'দারার দু'পাশে দুটো লোহার খুঁটি পোঁতা আর তার সঙ্গে আড়াআড়ি লোহার রড জুড়ে কপিকল ফিট করা। কিন্তু এ কপিকল কি এখনকার? মোটেই না। সেই সেকালেরই। শুধু দড়ি বালতিটাই এখনকার।

যীশু, তপেন আর ছেনো কোনভাবে এই জঙ্গলে এসে পড়ে, জলের ব্যবস্থা দেখেই বোধ হয় থাকার মতলব ঠিক করেছিল। না হলে ভাঙা দুর্গ, হুমড়ে পড়া অট্টালিকা, ধ্বসে যাওয়া প্রাসাদ, এসব তো অনেক জায়গাতেই মেলে। সেখানে লুকিয়ে থাকা হয়তো যায়। কিন্তু জলের জন্যে লোকালয়ে বেরোতেই হবে।

কিন্তু কেন এদের আত্মগোপনের চেষ্টা? সে কথা ওরাই জানে আর ওদের ভগবান জানেন।

অথচ খাওয়া পরার বাহারটি তো কিছু কম নয়।

মুরগীটা কেটে কুটে যীশু সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছিল, ছেনো স্টোভ জেলে সেটা রান্নার ব্যবস্থা করছে। তপেন সিগারেট খেতে খেতে বলল, ভাত রাঁধবার সময় চাল একটু বেশী নিস ছেনো।

বেশী?

ছেনো ভুরু কুঁচকে বলল, কেন?

কেন আবার? একটা হাঁ বাড়ল না?

বটে? ওই বিচ্ছুটাকে মুরগীর ঝোল ভাত সাপ্লাই করতে হবে?

কী আশ্চর্য। হবে না? কেষ্টর জীব তো একটা? মুরগীর ঝোল ছাড়া কচুর ঝোল পাচ্ছিস কোথায়?

থাক তপেনদা, আর কেষ্ট দেখাতে আসিস নে। ওই বিচ্ছুটাকে খাইয়ে দাইয়ে চাঙ্গা করে তারপর? ছেড়ে দেবে বোধ হয়? আর ও গিয়ে তার মামা, কাকা, বাপ ঠাকুদ্দা সবাইকে খবর দিয়ে এখানের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসুক, কেমন?

যীশু হাত ধুয়ে এসে তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে বলল, দিলেই হতো ফিনিস করে তখনই। তপাদার যে আবার প্রেম উথলে উঠল।

যা বলেছিস গুরু! শাস্ত্রে বলেছে—শত্রুর ছিটেটুকুও রাখতে নেই। খেতে টেতে দেবার দরকার নেই। যাকে বলে হাতে না মেরে ভাতে মারা হোক। উঃ, ওইটুকু ছেলে কী ধুরন্ধর! বলে কিনা, মামার নাম নাড়ু মামা!

তপাদা বলল, তোরা যে গোড়াতেই বোকামী করে বসলি। দেখেই 'মারবো কাটবো' করতে গেলি। আমি আগে দেখতে পেলে কথায় রসগোল্লার রস মাখিয়ে আদর জানিয়ে ভেতরের কথা জেনে নিতাম।

বলতো না কি? ওটি সোজা ছেলে নয়, বুঝলে? ও একটি গুপ্তচর।

আরে বাবা, ভালবাসা দেখিয়ে বিশ্বাস জন্মিয়ে নিয়ে কায়দা করতে হয়। এই যে বলে ফেলল, এই সমস্ত জঙ্গল টঙ্গল, পুরো শালতোড়াটাই নাকি একদা ওর দাদুর দাদুর সম্পত্তি ছিল, এটার মানে জানা দরকার নয়?

যীশু মুখ বাঁকিয়ে বলে, স্রেফ গুল। ওটি ছেলে নয়, ঘুঘু! কী মুখচোখ দেখেছিলি? ছুরি দেখে কেঁদে ফেলে না, এমন ছেলে দেখেছিস কখনো?

তপেন বলল, এখন কিন্তু মাঝে মাঝে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠছে।

কই?

আরে, এখান থেকে কি আর শোনা যাবে? যা দেওয়াল যা দরজা। আমি দরজার ধারে ঘুরছিলাম, তাই কানে এলো।

তা নয় প্রভু, দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়েছিলে তাই বল।

তা না হয় ছিলামই। আমি কিন্তু তোদের ধরনে চিন্তা করি না। ভাবছি ছেলেটাকে তুতিয়ে পাতিয়ে পোষ মানিয়ে, দলে ভর্তি করে নিতে পারা যায় কিনা। একটা বাচ্চা ছেলেকে অনেক উপকারে লাগানো যায়।

যীশু অগ্রাহ্যের হাসি হাসে।

আর ছেনো মুখ বাঁকিয়ে বলে, তবে মুরগীর ঝোল আর দেরাদুন রাইসের ভাত খাইয়ে পোষমানা! ওটি পোষমানবার মাল নয় হে তপাদা।

বলল, তবে চাল একটু বেশী নিল না তা নয়।

আধ ঘুমন্ত আধ জাগন্ত জিরে হঠাৎ চোখে কড়া রোদ্দুরের আলো লাগায়, চমকে তাকিয়ে দেখল গম্বুজ ঘরের দরজাটা খোলা হয়েছে। দরজার সামনে সেই তপাদা।

দরজা যে কোনোদিন খোলা পাবে, এ আশা করছিল না জিরে, তাই এখন আহ্লাদে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। যাক, তা হলে জিরেকে গুম-খুন করে ফেলার মতলব নেই মনে হচ্ছে। এই সে দিন একটা গোয়েন্দা গল্পে 'গুম-খুন' কথাটা পড়েছে জিরে, আর মানেটাও জেনেছে তাই এটাই ভেবেছে।

কী হে চান টান করবে না কি?

বলল তপাদা।

জিরে অবাক হয়ে বলল, চান? এখানে? কী করে?

কী করে আবার মাথায় তেল মেখে, জল ঢেলে।

জিরে বিরক্ত গলায় বলল, এখানে আমার জামা প্যান্ট আছে বুঝি? তোয়ালে, সাবান, টুথব্রাশ টুথপেস্ট?

ওবাবা! এতো সব চাই?

জিরে রেগে বলল, আমি তো বলি নি চাই। আপনি চানের কথা বলতে এলেন কেন?

পিছন থেকে ছেনোর গলা পাওয়া গেল, তপাদা, দেখলি? বলি নি?

আরে বাবা, থামতো তুই। তা খোকা তোমার নামটি যেন কী?

বলেছিতো জ্যোতিরিন্দ্র মল্লিক।

বেশ বেশ। তা জ্যোতিবাবু ভাত খাবার আগে অন্তত একটু হাতমুখ ধোওয়াওতো দরকার?

ভাত!

জিরের খিদেয় ধুঁকে পড়া শরীরটা যেন 'ভাতের' নাম শুনে একবার উল্লাসে দুলে উঠল, তারপরই মন বিদ্রোহ করল। অতএব রেগে রেগেই বলল, এখানে আমি ভাত খেতে যাব কেন?

বাঃ! এখানে যখন থাকতে হয়েছে, ভাত না খেলে?

আমি এখানে থাকতেও চাই না, ভাত খেতেও চাই না।...বলে জিরে দাঁড়িয়ে উঠে দরজার কাছে চলে আসতে চায়। বলে, আমায় ছেড়ে দিন, আমি আমার মামাকে খুঁজবো!

তপেন শান্ত গলায় বলে, আহা, তুমি ছেলেমানুষ তুমি একা একা কোথায় খুঁজতে যাবে? আবারও তো রাস্তা হারিয়ে ফেলবে। তার থেকে খাওয়া দাওয়া করে বোসো, মামার আর তোমার সেই দাদুর নাম ঠিকানা টিকানা বলো, আমরাই চেষ্টা করে খবর নিয়ে তোমার খবর দিই।

জিরে বলল, আমার সেই দাদু মানে? কোন দাদু?

আহা হা, তোমার সেই রাজামশাই দাদু। যিনি এই সব জঙ্গল টঙ্গল ইয়ে পুরো শালতোড়েরই মালিক।

দাদু মালিক, দাদু রাজা, একথা বলেছি আমি?

জিরে লাল লাল মুখে বলল, বলেছি তো দাদুর দাদু রাজা ছিলেন এখানকার।

ওই হলো। তো নাম ঠিকানাগুলো পেলে খুঁজতে পারি এখন একটু নেয়ে খেয়ে নিয়ে—

জিরের অবশ্য খুবই লোভ হলো, তবু জিরে মনের জোর করে বলল, খাবো টাবো না। আপনাদের আমার বিশ্বাস নেই

অ্যাঁ! কী বললি?...ছেনো গলা বাড়িয়ে রেগে বলল, আমাদেরকে তোর বিশ্বাস নেই?

জিরে জোর গলায় বলল, নেইই তো। ইচ্ছে করলেই তো আপনারা ভাতের সঙ্গে বিষ টিষ মিশিয়ে দিয়ে আমায় মেরে ফেলতে পারেন।

তপাদা!

ছেনো ছিটকে উঠলো, শুনলি? এইটুকু ছেলের মধ্যে, কী শয়তানের বাস! বলে কিনা—বিষ টিষ মিশিয়ে। অ্যাঁ! বললি কী করে রে?

জিরে বলল, তা এতো রাগ করছেন কেন? ছুরি মেরে তো মেরেই ফেলছিলেন তখন।

ছেনো হাঁক পাড়ে, ও গুরু। শুনে যা। দোহাই তোর আয় একবার। নিজের কানে শুনে যা! একী ছেলে রে! পুঁতে দিলে গাছ গজাবে।

তপেন নীচুগলায় বলল, আঃ, তোরা একটু থাম বাবা। ক্ষ্যাপাকে আর ক্ষ্যাপাস নি।

তারপর বলল, তা জ্যোতিবাবু, দেখছ যখন আমাদের হাতে ছুরি ছোরাও আছে, তখন আর

বিষেই বা ভয় কী? না হয় মরবার আগে একটু মুরগীর ঝোল ভাত খেয়েই নেবেন।

মুরগীর ঝোল!

সেই মুরগীটা!

ওই যীশুবাবু যেটাকে ছাল ছাড়াচ্ছিল।

জিরে মুখ বাঁকিয়ে বলে, সেই মুরগীটা? খেতে আমার দায় পড়েছে! ইস!

যীশু এসে দাঁড়িয়েছিল।

চড়া গলায় বলে উঠল, তপাদা। আমায় ছেড়েদে ওটাকে উচিত শিক্ষা দিই। দেখতে পাচ্ছিস, পাক্কা স্পাই। এই শয়তান, ভাত খাবি না তো কি না খেয়ে মরবি?

মরবোই বা কেন? আমায় ছেড়ে দিননা। বাড়িতে কি খাবার জিনিস নেই?

তপেন কিন্তু মেজাজ ঠিক রাখে।

একটু হেসে বলে, আচ্ছা, না হয় ছেড়েই দিলাম। তা তুমি বাড়ি খুঁজে পাবে?

জিরের যদিও সন্দেহ ছিল খুঁজে পাবে না। তবু ওর কালিংপঙের দাদুর শিক্ষার কথাটা মনে পড়ে গেল। সে দাদু জিরের ছেলেবেলায় একদিন বলেছিলেন, নিজের বাড়ির ঠিকানা, আর বাড়ির লোকেদের নামগুলো খুব ভাল করে মুখস্থ করে রাখবি আর যদি কখনো কোথাও হারিয়ে যাস, রাস্তার কাউকে বলবি, আমায় এখানের পোস্ট অফিসটা দেখিয়ে দিনতো—, যেন তোর পোস্ট অফিসেই দরকার। তা নইলে তুই হারিয়ে গিয়েছিস বুঝতে পারলে, রাস্তার মন্দলোকেরা ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। পোস্ট অফিসে পৌঁছলে, সেখানে পিয়ন টিয়ন কাউকে বলবি, 'রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, আমায় এই ঠিকানায় পৌঁছে দাও তো, বাড়ি গিয়ে বখশীস দেব।'

হঠাৎ সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল জিরের, তাই চটপট উত্তর দিয়ে দিল, বন থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে ঠিকই যাবো। আর যদি না পাই, রাস্তার কারো কাছ থেকে পোস্ট অফিসটা কোথায় জেনে নিয়ে, সেখানে গিয়ে কোনো পিয়নের সঙ্গে চলে যাব বাড়ি। পিয়নরা তো চিঠি বিলি করে করে সব বাড়ির রাস্তা চিনে রাখে।

ভালো মোর যাদুরে! ছেনো বলে উঠে, সাধে বলছি, এ ছেলেকে নদীর এপারে পুঁতে দিলে ওপারে গাছ গজাবে। তবে আর তোমার ভাত খেয়ে কাজ নেই যাদু, যেমন আছো থাকো। এরপর খবরদার বলতে আসবি না, একটা ছোটছেলে নাখেয়ে মরে গেল, এরা এমন ছোটলোক যে, একবার খেতে বলল না।

এতো দুঃখের মধ্যেও জিরে হি হি করে হেসে উঠে বলল, আহা! কী বুদ্ধিধরে! মরেই যদি যাই তো—বলতে আসবো কী করে শুনি?

তপেন খুব আস্তে ইংরেজিতে বলল, যীশুরে, ছেলেটা একটা জিনিয়াস। পোষ মানিয়ে দলে ভরে ফেলতে পারলে, ভবিষ্যতে খুব লাভবান হওয়া যেত।

যীশু মুখ বাঁকিয়ে বলল, তা মানাওনা পোষ! ভাতে বিষ মেশাবার ভয়ে যে ছেলে এতো খিদের সময় খেতে চায় না, তাকে তুমি পোষ মানাবে! হুঁঃ!

জগতে কতো অসম্ভবও সম্ভব হয়।

বলে তপেন জিরেকে বলল, তা বাবা জ্যোতিরিন্দ্র, ভাত না খাও, দুখানা বিস্কিট খাও না হয়। এই দ্যাখো আমি খাচ্ছি, বিষ মেশানো থাকলে তো—

বলে প্যান্টের পকেট থেকে পাতলা কাগজে মোড়া খান কয়েক বিস্কিট বার করে তপেন তার থেকে নিজে একটা খেয়ে জিরের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

কতই যেন দয়া করছে, এই ভাবে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে জিরে বলল, ঠিক আছে, খাব! তাহলে হাতটা ধুয়ে নিই। কোথায় জল?

ইঁদারার ধারে ওকে নিয়ে এলো ছেনো। কপিকলের দড়ি টেনে সড়সড় করে এক বালতি জল তুলে বলল, নে।

জিরে ইঁদারাটা দেখে হাঁ।

এই অদভুত জায়গায় এমন বিশাল একটা ইঁদারা থাকতে পারে? শালতোড়ের দাদুর বাড়ির ইঁদারাটার ডবলের ডবল। এরাই বানিয়েছে নাকি? না কি এই জঙ্গলের মধ্যে ছিলই আগে থেকে? খুব পুরনো পুরণোই লাগছে কিন্তু।

এই, হাঁ করে ভাবছিস কী?

ছেনো রেগে বলে, জল নে? তোর সেবা সমাপ্ত করে তবে তো আমাদের ছুটি। বেশী বেগড়বাই করবি তো, দেব এই ফোকর দিয়ে জলের মধ্যে ফেলে।

জিরে হাত ধুতে ধুতে ধিক্কারের মত করে বলে। এতো অসভ্য লোক আমি জীবনে দেখি নি।

মহাকাশে মাকড়শার জাল

(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)

নারায়ণ চক্রবর্তী

খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, না? মহাকাশে আবার মাকড়শার জাল এলো কোত্থেকে? তাই বলে এটাকে গাল-গপ্পো বলে ভেবে বোসো না। দুটো মাকড়শা সত্যি সত্যিই মহাকাশে গিয়েছিল আর সেখানে গিয়ে তারা একটি নয়, দুটি নয়, পাঁচ পাঁচটি জাল বুনেছিল! ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, তেমনি আর কি।

ব্যাপারটা তা হলে খোলসা করেই বলি। নাসা-র নাম শুনেছ তো? না না, এ নাসা মানে নাক নয়, এ নাসা আলাদা, এর পুরো নাম হচ্ছে ন্যাশন্যাল এরোনটিক স্পেস অথরিটি মার্কিন মুলুকের। চারটে আদ্য অক্ষর নিয়ে সংক্ষেপে NASA এখান থেকেই কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া হয়, মহাকাশযানও ছাড়া হয়।

তা, নাসার কর্তৃপক্ষ একবার করলেন কি, আমেরিকার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতরে একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। বিষয়ঃ এবার যে মহাকাশযান ছাড়া হবে তাতে পৃথিবীর কোন জীব পাঠানো যায়।

ম্যাসাচুসেটের স্কুলের ছাত্রী জুডিথ মাইলস নামে বাচ্চা মেয়েটি নাসাকে লিখল,—"এবার মাকড়শাকে পাঠানো হোক, ওরা মহাকাশের ভারশূন্য অবস্থায় জাল বুনতে পারে কিনা দেখা যাক।"

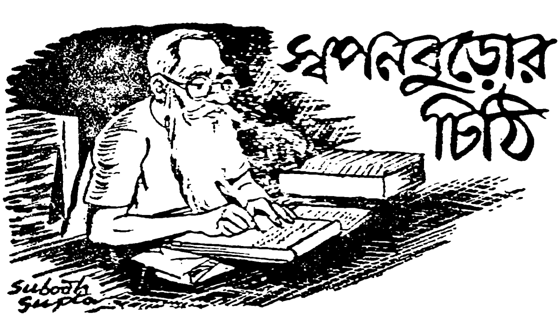
কথাটা নাসা কর্তৃপক্ষের বেশ পছন্দ হ'ল। এর আগে মানুষ তো গিয়েছিলই, বাঁদর, কুকুর, এমন কি ছোট গাছ-পালাও মহাকাশযানে চেপে পৃথিবীর চার পাশে কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে কিছুদিন থেকে আবার ফিরে এসেছে পৃথিবীতে। কিন্তু মাকড়শা পাঠাবার কথা কারুর মাথায় আসে নি।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি কাটিয়ে ২০০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার ওপরে উঠে যায় আর প্রতি ৯০ মিনিটে একবার করে পৃথিবীর চার পাশ ঘুরে আসে। পৃথিবী থেকে এত উঁচুতে থাকায় কৃত্রিম উপগ্রহে সব কিছুই ভারশূন্য, ওজন-হীন অবস্থায় থাকে।

সে যাই হোক পরবর্তী কৃত্রিম উপগ্রহে দুটি মাকড়শাকেও পাঠানো হ'ল। জুডিথ মাইলস-এর আনন্দের আর সীমা নেই, সে দিন রাত বসে বসে শুধু ভাবছে যে ও জনহীন অবস্থায় ঐ মাকড়শা দুটো জাল বুনতে পারবে তো? পারলেও কেমন হবে সেই জাল? তা, মাকড়শা দুটো জুডিথকে নিরাশ করল না, মহাশূন্যে তারা একটি নয়, দুটি নয়, পাঁচ পাঁচটি জাল বুনে ফেলল মহা উৎসাহে।

যথা সময়ে সেই কৃত্রিম উপগ্রহ ফিরে এলো। পিটার উইট নামে একজন মার্কিন বিজ্ঞানী সেই জাল পাঁচটি পরীক্ষা করে দেখলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে মাকড়শা দুটির পৃথিবীতে বোনা জালের সঙ্গে মহাশূন্যে বোনা জালের বেশ একটু পার্থক্য আছে। একেই তো মাকড়শার জালের সুতো খুব সরু হয়, কিন্তু মহাকাশে বোনা জালের সুতো তার চেয়েও শতকরা কুড়ি ভাগ বেশি সরু। তা ছাড়া কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসে লম্বা সুতোগুলো যে কোন বা এ্যাঙ্গল তৈরী করে তার ভেতরেও বেশ পার্থক্য আছে। তা ছাড়া মহাকাশে বোনা জালের সুতোগুলোও বেশ এলোমেলো সুতোগুলো ঠিক মতন ঘুরিয়ে প্যাঁচ দিতে পারে নি লম্বা সুতোর চারপাশে। ভারশূন্যতার জন্য তারা নিজেদের ব্যালান্স রাখতে পারে নি ঠিক মতো।

পৃথিবীতে এ্যাম্ফিটামাইন নামে একরকম মাদক দ্রব্য খাওয়ালেও মাকড়শারা ঠিক ঐ রকম খাপছাড়া জাল বোনে।



আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুর দল

শীতের পরেই আমাদের আনন্দ দিতে—কিশলয় জাগিয়ে, ফুল ফুটিয়ে মুকুল ছড়িয়ে কোকিলের ডাক শুনিয়ে আসে বসন্ত কাল।

এই কথাই আমরা চিরকাল শুনে আসছি। তোমরাও নানা কবির কবিতায় মধুর বসন্ত ঋতুর সুন্দর সুন্দর বিবরণী পড়েছ। ছড়া মুখস্থ করেছ। বসন্ত কালের কত ভাবে ভরা কবিতা মুখস্থ করেছ। আর গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠে কত মনজাগানো, প্রাণভরানো বসন্তের গান শুনেছ।

কিন্তু এখন আমাদের চোখের সামনের জগতে কি দেখতে পাচ্ছ?

সেদিন এক প্রবীণ শিক্ষাবিদের সঙ্গে দেখা হল। তিনি সারাজীবন ধরে শিক্ষকতা করেছেন, আর মন-প্রাণ ঢেলে ছোটদের শিক্ষাদান করেছেন।

কত সুন্দর সুন্দর কবিতা ছোটদের মুখস্থ করিয়েছেন, ছোটদের হাতের লেখা যাতে ভালো হয়, মুক্তোর মত সুন্দর দেখতে হয় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বারে বারে শ্লেট দিয়েছেন।

সেই লেখার ওপর দিয়ে ছেলেমেয়েরা যাতে দাগা বুলোয় তার জন্য সর্বদা তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকতো।

সেই সাদা হাসাময় মানুষটির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনি নিজের কপালে এক চাপড় মেরে বললেন, এই যে সারা জীবন ছোটদের ভালোর জন্যে গাধার খাটুনি খাটলাম, কি হল? সেই অতি বুড়ো শিশুদরদী বললেন, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একেবারে তাকাই নি। সংসারের ভালো-মন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করি নি। প্রাইভেট টিউশনি করে টাকা উপায় করবো, সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর দিই নি! শুধু নিজের পাঠশালাটি নিয়ে মত্ত হয়ে ছিলাম, আর ছেলেমেয়েদের কি করে একটু আনন্দ দেবো, একটু শেখাবো, একটু হাতের লেখা মুক্তোর মতো করবো—এই নিয়েই দিন-রাত মসগুল থাকতাম।

বুড়ো মানুষ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন! তারপর নিজের ঘোলাটে চোখ তুলে বললেন, আজ এই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ভাবছি, জীবনের সবটাই বুঝি একেবারে বাজে খরচ হয়ে গেল!

দেখুন, আমরা ছেলেবেলায় মাটিতে গুরুমশায়ের লেখা অ-আ-ক-খ-তে দাগা বুলোতাম কখনো যদি জুটত তা হলে তালপাতার ওপর ভুষো কালি দিয়ে লিখতাম। মুখে মুখে কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া শিখতাম। কত রকম ছড়া মুখস্থ বলতে পারতাম। তাতে কি আমাদের লেখাপড়া শেখা হয় নি? আমাদের হাতের লেখা মুক্তোর মত সুন্দর হয় নি? বুড়ো মানুষটি আপন মনেই আফশোষ করতে লাগলেন। সেই বৃদ্ধের কণ্ঠে আবার হতাশার বাণী ফুটে উঠল।

খানিকটা ঘোলাটে চোখে চেয়ে রইলেন তিনি। তার গলায় শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করছে। ভালো করে মনের কথা গুছিয়ে বলতেও পারছেন না। তবু তাঁর মনে-মুখে একটা করুণ নিরাশার বাণী ফুটে উঠল।

বললেন, আজকাল ছোটদের কিছু শেখাতে গেলেও সাত ঝামেলা। মাটিতে লেখা চলবে না। তালপাতায় লেখার কথা বললে লোকে হাসবে। এখন দশটা রুল-টানা খাতা চাই। যার পয়সা নেই, তার ছেলেমেয়ের লেখাপড়া ত' সেইখানেই হয়ে গেল! মা সরস্বতী আর সেদিকে পদার্পণ করবেন না। ঝামেলা কি এক রকমের? শত ঝামেলায় জেরবার!

পাঠ্যপুস্তকের তালিকা মিলবে, কিন্তু দোকানে বই মিলবে না। আর আপনি ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে ভর্তি করবেন কি করে? শেষ রাত থেকে লাইন দিতে হবে। কিন্তু ভর্তি করবে মাত্র কয়েকটিকে। বাকি ছেলেমেয়ে মুখ্যু হয়ে থাক। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াক, রোয়াকে বসে আড্ডা দিক, অথবা পকেটকাটা হোক—সে দিকে কারো এতটুকু নজর নেই।

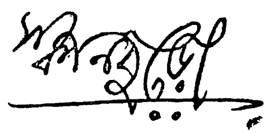
শুধু কি তাই?

সন্ধ্যেবেলা আলো জ্বলবে না। ছেলেমেয়েরা পড়বে কি করে? কেরোসিন পাওয়া যায় না। যা মেলে—তারও দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে। ছোটদের রোজকার খাবার জোটাবেন কি করে? বাজারে সব জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। না খেতে পেয়ে সবাইকার হাড্ডিসার চেহারা। ওই শীর্ণ চেহারায় বিদ্যেও বাসা বাঁধতে ভয় পায়।

ফলে মা সরস্বতী মুখ বাঁকিয়ে পালিয়ে গেছেন। আমাদের কর্তারা দেশটা ভাগ করে দিলে। ফলে গোটা জাতি গরীব হয়ে গেল। এতে কার কি ভালো হল আমায় বলতে পারেন? গাছ কেটে সব সাফ করে দিয়েছে। কোথায় ফুল ফুটবে—ফল ফলবে? জবাব দিন।

সেদিন সেই ঘোলাটে চোখ, হতাশায় ভরা কণ্ঠের মানুষটির কোনো কথার জবাব দিতে পারি নি।

তোমাদের বন্ধু



তোমাদের চিঠির উত্তর

দোদুল বিশ্বাস (রামপুর হাট, বীরভূম)

তুমি তোমার নামের বানান ভুল লিখেছ। ভালো করে বানানটা দেখে নাও। খেলাধুলো পৃথিবীর আদিকাল থেকেই চলতি ছিল। আগে মানুষ পাথর ছুঁড়ে, তীর ধনুক তৈরী করে শিকার করত। পরবর্তী জীবনে মানুষ ধীরে ধীরে নানাজাতীয় খেলাধুলোর সৃষ্টি করে।

হাসান আলি সাঁপুই (রাজবাড়ী কলোনী)

তুমি কবিতা লিখতে সুরু করেছ, সেটা ভালো কথা। আগে মিল ছন্দ ভাব—এই সব ঠিক মতো জেনে নিতে হবে। নামকরা কবিদের সুন্দর সুন্দর কবিতা পড়ো। তা হলে তোমার জ্ঞান বাড়বে। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কাজি নজরুল, সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, সুকান্ত ভট্টাচার্য এঁদের কবিতা পড়বে, আর মুখস্থ করবে।

মিল আর ছন্দেই কবিতা খাঁটি—
ভাব আর ভাষা তবে সকলি মাটি ॥

সর্বাণী সাধু খাঁ (কৃষ্ণনগর)

ছোটদের পত্রিকা পড়তে তোমার খুব ভালো লাগে জেনে খুশী হলাম। আমরাও ছেলেবেলায় 'শিশু' কাগজ আনন্দ করে পড়তাম। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সাহায্যে এই ছোট্ট কাগজটি প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন বরদা মজুমদার। তুমি আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছ। লিখে নাও—২৫, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

তাপস চক্রবর্তী (মাধবনগর, মালদহ)

তুমি ঝলমল কাগজের গ্রাহক জেনে আনন্দিত হলাম। আর কোন্ কোন্ শিশু পত্রিকা তুমি পড়ো জানাবে। আগে চিঠি লিখেছিলে, কিন্তু উত্তর পাও নি। সাধারণতঃ চিঠি পেলে আমি উত্তর দিয়ে থাকি। হয়তো দেরী হতে পারে। অনেক সময় ডাকের গোলমালে চিঠি খোয়া যায়।

ডাক পিয়নের খেয়াল-খুশী
আসবে কখন ডাক ?
মিছেই মোদের হা-পিত্যেশ
মিথ্যে যে হাঁক-ডাক ॥

অপরাজিত জাগতি (আমরা সবাই, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া)

তোমাদের "আমরা সবাই" ভালোভাবে, সুন্দর নিয়মে চলুক, এই কামনা জানাই। তোমাদের শিশু উৎসব সকলের মনোহরণ করেছে এটাও খুশীর খবর। তোমরা কবিগুরুর জন্মদিন পালন করেছ। সেজন্য প্রশংসার দাবী করতে পার।

"আমরা সবাই" উঠুক জেগে
নৃত্য, ছড়া গানে
সব শিশুদের ডাক দিয়ে যাক—
ঘুম ভাঙানো তানে ॥

আলোক চক্রবর্তী (কসবা, কলিকাতা-৪২)

তুমি সাহিত্যপথে এগিয়ে আসতে চাও—সেজন্যে তোমায় নিশ্চয়ই উৎসাহ দেবো, আর আশীর্বাদ জানাবো।

জীবনপথে চলতে গিয়ে
বাণীর প্রসাদ লভো
আপন গুণে সবার মাতাও
অধিক কি আর কবো ?

তাপস বণিক (চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান)

তুমি ঝলমলের পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও। অর্থাৎ লেখনী বন্ধু চাও। এ বিষয়ে তোমাকে সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আর একটি "লেখনী বন্ধু বিভাগ" খোলবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাতে হবে।

শিবানী ও গোপা (দেবগ্রাম, নদীয়া)

তোমাদের চিঠি পেয়ে খুশী হলাম। তোমাদের হাতের লেখা সুন্দর। আর বক্তব্য বিষয় বেশ গুছিয়ে লিখতে পেরেছ। শুধু শহর নিয়ে ত' সাহিত্য হয় না। গ্রামকেও মনের কোণে আসন দিতে হবে।

শহর ও গ্রামবাসী যতেক মানুষ
সবাকার মন যেন নয়কো ফানুষ—।
সকলের ভালোবাসা সাহিত্যে রয়—
কবিদল শতমুখে সেই কথা কয় ॥

নীলিমা দাস (দেবগ্রাম, নদীয়া)

তোমার মধুর চিঠিখানি আন্তরিকতা ও দরদে ভরা। ওখানে ছেলেমেয়েদের আসর কেমন চলছে জানিও। নতুন বই পড়ো।

মীনা ঘোষ (উত্তর কলকাতা)

আশা করি তোমাদের নাটক খুব ভালোভাবে অভিনীত হয়েছে, আর সবাই তোমাদের গুণপণা দেখে প্রশংসা করেছে।

নাটক দেখি নি, তবু মনে ভাবি—
তব গান হল মধুর সুরে—
মনে মনে আমি পেয়েছি বারতা—
শুনেছি সে গান, থাকি নি দূরে ॥



দেবতা দিল সাজা

দিলীপ কুমার মিত্র

ঘটনাটা ঘটেছিল বেশ কিছুদিন আগে।

মধ্যপ্রদেশের রত্নগিরি জেলার এক গ্রাম্য পথে চলেছে এক গরুর গাড়ি। ছাউনির নিচে আরোহী মাত্র দুজন। কোলে শিশু সন্তান নিয়ে বিশ বছরের এক যুবতী—গাড়ির ঝাঁকানিতে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে। দৃষ্টি তার উদাস। চোখের কোল বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে শুকিয়ে গেছে। হাঁটুর কাছে একটা কাপড়ের পুঁটুলি। সেটাও গাড়ির ঝাঁকানিতে দোল খাচ্ছে। ছোট একটা টিনের প্যাঁটরা মেয়েটি বাঁ দাবনার তলায় সযত্নে চেপে বসে আছে। জন্মের মতো স্বামীর ঘর ছেড়ে চলেছে সে বাপের বাড়িতে আশ্রয়ের সন্ধানে।

কৌশল্যার বিয়ে হয়েছিল ছান্দোরা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত চাষী পরিবারে। তখন তার বয়স বারো। স্বামী ব্রীজমোহনের সঙ্গে, তার বয়স পনেরো।

বিয়ের পরে কিশোর ব্রীজমোহন দেখতে দেখতে এক যোয়ান মরদ হয়ে উঠলো।

বড় ভেইয়া জগমোহনকে ক্ষেতির কামে রীতিমত মদত দিতে শুরু করল। সময়মত কৌশল্যার কোলে এক ফুটফুটে ছেলেও এলো। বেশ আনন্দের সঙ্গেই হেসে খেলে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল ওদের। কিন্ত অত সুখ বুঝি বিধাতার প্রাণে আর সয় না!

চাষের কাজ সেরে এক সন্ধ্যায় যখন ব্রীজমোহন ঘরে ফিরল, তখন তার সারা দেহ জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। সমস্ত খুন চড়ে উঠেছে শিরে। অল্প সময়ের মধ্যেই বিলকুল বেহুঁশ হয়ে পড়ল অমন যোয়ান মরদটা।

পাশের গ্রাম থেকে ডাক্তার বদ্যি নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল বড় ভাই জগমোহন। সাধ্যমত দাওয়াই খাওয়াল ছোট ভাইকে। কিন্তু হুঁশ আর ফিরে এলো না ভেইয়ার। রক্ত মাথা থেকে আর নামল না। ছেলে বউকে রেখে ব্রীজমোহন চিরতরে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।

ছোট ভায়ের বউকে এবং বাচ্চাটাকে বেশ স্নেহই করতো জগমোহন। কৌশল্যার যাতে কোন রকম

কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, সেদিকে সব সময়েই নজর দিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে গেল বিগড়ে। মারমুখী হয়ে উঠলো, কৌশল্যা আর তার দুধের বাচ্চাটার উপর। যেন দুটোকে তাড়াতে পারলে বাঁচে।

এমনটা হল কেন? কারণটা জগমোহনের বউ শকুন্তলা। দেওর মরার পরের দিন থেকেই সে স্বামীর কানে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করল। ব্রীজমোহনের বিধবা বউটাকে যদি ভাগাতে পারা যায়, তবে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি জমি-জমা তাদের একলার হয়ে যাবে। আর দুভাগ করতে হবে না কোন কিছুকেই।

শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর বুদ্ধিটাই উত্তম বলে বিবেচিত হল জগমোহনের কাছে। গিন্নীর হাতে হাত মিলিয়ে কর্তাও ভাদ্র বৌকে তাড়াতে কোমর বেঁধে লেগে গেল।

ভাগ্যহীনা কৌশল্যা আর তিষ্ঠতে পারল না তাদের উৎপীড়নের জ্বালায়।

শুধু একবস্ত্রে খালি হাতে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে স্বামীর সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হচ্ছিল অনাথা বিধবাটাকে। অনেক কাঁদাকাটির পর একজন জ্ঞাতি বর্ষীয়ান মহিলার মধ্যস্থতার ঠিক হল। সোনা রূপার গহনাগাটি কৌশল্যার যা কিছু আছে, তা সে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

একটা ভাঙ্গা ছোট টিনের প্যাটরার মধ্যে গহনাগাটিগুলো খুব যত্ন সহকারে নিয়ে, সেটাকে শাড়ির ছেঁড়া পাড় দিয়ে বেশ করে বেঁধে নিল কৌশল্যা। ধাতুর এই টুকরো কটাই এখন তার দুধের বাচ্চার একমাত্র সম্বল। বেচারা ব্রীজমোহন! বুকে থাবড়া মেরে মরদের মতো বলেছিল, লেড়কাকে শরিফ আদমি করবে। ওসব ক্ষেতির কাম করতে দিবে না। শহরে পাঠিয়ে লিখাপড়া শিখারে।

গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ভজনলাল উঠানেই বসে অপেক্ষা করছিল। পরিচিত লোক সে। তার গাড়িতেই কৌশল্যা যাবে সীতাপুরে তার বাপের বাড়িতে। সীতাপুর এখান থেকে পনেরো-ষোল ক্রোশের পথ। বাপের বাড়ি বলতে শুধু মাত্র একটা ভাই। তারই দুবেলা পেট চলে না। তবুও কৌশল্যাকে যেতে হবে সেখানেই। সে নিরুপায়। অশ্রয়হীনা।

গাড়িতে তোলার জন্য গহনার বাক্সটা ছোটবাবুর হাত থেকে নিতে গেল ভজনলাল। কৌশল্যা সেটা না দিয়ে বাচ্চার কাঁথার পুঁটুলিটা এগিয়ে দিল গাড়োয়ান ভজনলালকে। নিজে অতি সাবধানে জিনিসটা নিয়ে গাড়িতে উঠলো। বাচ্চাটা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

শ্বশুরবাড়ি থেকে চোখের জলে বিদায় নিল কৌশল্যা।

গরুর গাড়ি চলেছে নিজের গতিতে ঝাঁকানি আর মৃদু দোলানি দিতে দিতে। ভজনলাল কখনও তুলসী দাসী ভজনের সুর ভাঁজছে, কখনও বা তাদের ছোট বন্ধুর সঙ্গে দু একটা কথা বলছে।

এইভাবে ক্রোশ দশেক পথ যাবার পর সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর গোশকট তখন এসে পৌঁছল সেই বিস্তীর্ণ মাঠ মোরানটাঁড়ের কাছে। সেটা পেরোতে হবে তাদের। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। কেবল মাঝবরাবর জায়গায় বিশাল এক অশ্বথ গাছ শাখা প্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে। তার গোড়ায় কিছু দেবদেবী নুড়ি পাথরের রূপ নিয়ে বিরাজমান। বুড়ি মেয়েরা ভোর বেলা নদীতে স্নান কার জল দিয়ে যায় ঐ শিলাগুলোর মাথায়। সারা দিনে তাঁরা ঐটুকু মাত্র সেবা পান।

গাড়ি মাঠে পড়তেই ভজনলালের মধ্যে যেন একটা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটলো। সে গম্ভীর হয়ে গেল এবং গাড়িটা সাধ্যমত জোরে চালিয়ে অশ্বথ গাছের নিচে ক্যাঁচর ক্যাঁচ করে থামিয়ে দিল জনমানবশূন্য মাঠ। গ্রীষ্মের দুপুর। কাঠ ফাটা রোদে চারিদিক ধু ধু করছে।

কৌশল্যার এপথ একেবারে অচেনা নয়। তবুও তার একটু ভয় করে বুকটা কেঁপে উঠলো। গাড়িটা হঠাৎ ভজনলাল থামালোই বা কেন! বলদ দুটোর বিশ্রাম আর খাওয়ানোর কাজ তো একটু আগেই সেরে নিয়েছে। ভজনলালের অকারণ গাম্ভীর্য ও ভাবগতিকের হেরফের কেমন যেন সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে কৌশল্যার কাছে।

ভজনলাল তড়াক করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। মাথা নুইয়ে গাড়ির নিচের চটের ঝোলা তাক থেকে একটা বড় কুড়ুল বার করে হাতে নিয়ে কৌশল্যার সামনে এসে দাঁড়াল।

কে এই লোক! ভজনলাল! না অন্য কেউ! ঠিক পিশাচের রূপ নিয়েছে ভজনলাল।

এক হাতে গহনার বাক্স, অন্যহাতে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে ভয়ে চোখ বুঁজলো কৌশল্যা! মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। এই আকস্মিক বিপদে আতঙ্কিত হয়ে কাঠ হয়ে গেল সে।

ডাকাতিয়া ঢঙে কর্কশ গলায় কৌশল্যার কাছে গহনার বাক্সটা চাইল ভজনলাল। একবার—দুবার তিনবার।

নাঃ কিছুতেই না! গহনার বাক্স প্রাণ থাকতে ছাড়বে না। তাকে যে ব্রীজমোহনের বংশধরকে বাঁচাতে হবে। প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরে রাখল বাক্সটা।—দেওতা তুমি বাঁচাও!

ভজনলালের বয়স ষাটের কাছাকাছি। দেহের গড়ন এখনও যুবার মতন! মাথায় গামছার পাগড়ি বেঁধে সাক্ষাৎ যমের মতো দাঁড়িয়ে। লালসা যে মানুষকে কত নিচে নামাতে পারে, সেই কথাটাই বোধ হয় একটু একটু ভাবছিল কৌশল্যা।

বাক্সটা আমার চাই। তোকেও আর জিন্দা রাখা যাবে না। এই কথা বলে সজোরে একটা হেঁচকা টান মেরে ভজনলাল ভারি কুড়ুলটা মাথার উপর তুললো। উদ্দেশ্য এক কোপে কৌশল্যার মাথাটা ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে।

কিন্তু কি হল! বোধ হয় আলগা ছিল। ফলাওয়ালা ভারি লোহাটা বাঁট থেকে খুলে ছিটকে পড়ল অশথ গাছের শিকড়ের পাশে একটা ফাটলের মধ্যে।

একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল শয়তানটা। কিন্তু কেন? ঐ তো দেখা যায় লোহার অংশটা একটু বেরিয়ে আছে। কাল বিলম্ব না করে ভজনলাল চট করে এগিয়ে গেল সেখানে। খাবলা মেরে তোলার জন্য হাত ঢোকাল ফাটলটায়।

এক সেকেণ্ড! বাপরে মারে করে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল ভজনলাল।

ততক্ষণে মাথার কাছ থেকে হাতখানেক দেহটা ফাটল থেকে বার করে বিশাল ফণা মিলে দুলে দুলে ফোঁস ফোঁস করছে বিষধরটা। যেন গর্জন করে বলছে, পাপিষ্ঠ তুই যমালয়ে যা। তোকে এই সাজা দিলাম।

আতঙ্কিত আড়ষ্টের ভাবটা কাটিয়ে উঠে কৌশল্যা ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর বাকী পথটুকু পায়ে হেঁটে বাপের বাড়ী নিরাপদে পেঁৗছে গেল।

এদিকে ভজনলালের দেহটা ক্রমশঃ নীল হতে লাগল এবং একটু পরেই মুখ দিয়ে গাঁজলা ভাঙ্গতে শুরু হল।

একটুখানি হাসো

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী মল্লিক

(১)

জজ: (চোরকে) তুমি তালা ভেঙেছ?

চোর: হ্যাঁ, হুজুর ভেঙেছি।

জজ: কেন?

চোর: আজ্ঞে, হুজুর আমার কাছে চাবি ছিল না।

(২)

বাড়ীতে বাবা রোজ বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলে। তার ছ'বছরের ছেলে তা' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। সেদিনও বাবা ও তার বন্ধুরা তাস খেলছিল ছেলে এসে দাঁড়ায়।

বাবা: খোকা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাস খেলা না দেখে এক দুই মুখস্থ করো।

ছেলে: এক দুই আমার অনেক আগে মুখস্থ হয়ে গেছে বাবা।

বাবা: গুড্। বেশ বলো ত'?

ছেলে: (গড় গড় করে) এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, গোলাম, বিবি, সাহেব······।



অন্ধকারে সবুজ আলো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

প্রথমে ঠিক হলো রামু মাহাতোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা হবে সবাইকে জিপ গাড়িতে তুলে জিপ গাড়িতে স্টার্ট দিল প্রিয়ব্রত।

একটুক্ষণ যাবার পর স্বপন জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, প্রিয়দা, আমরা এখানে কবে এসেছি?

প্রিয়ব্রত হিসেব করে বললো, দুদিন কেটে গেছে।

বিমান বললো, এর মধ্যে এত কিছু ঘটে গেল যে মনে হচ্ছে যেন অনেকদিন কেটে গেছে।

স্বপন জিজ্ঞেস করলো, কী কী ঘটনা ঘটেছে রে?

বিমান বললো, সবই তো তোকে নিয়ে।

—আমাকে নিয়ে? তার মানে?

প্রিয়ব্রত গম্ভীরভাবে বললো, এসব কথা এখন থাক্। কলিকাতায় গিয়ে হবে।

দহিজুড়ি গ্রামে পৌঁছতে বেশীক্ষণ লাগলো না।

রামু মাহাতোর বাবা লুকা মাহাতো বেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক। লম্বা, শক্তিশালী চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। তিনি তখনই হাসপাতালে যাবার জন্য বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জিপ থেকে নেমেই রামু ছুট্টে বাবার কাছে চলে গেল। লুকা মাহাতো কপালের ওপর হাত রেখে রোদ আড়াল করে ভালো করে দেখলেন গাড়িটা, তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপলোগ কেয়া পুলিশ হ্যায়?

প্রিয়ব্রতর লাল রঙের জিপটা দেখে অনেকেই একথা মনে করে।

প্রিয়ব্রত মাথা নেড়ে বললো, না, না, আমরা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি।

লুকা মাহাতো এবার জিজ্ঞেস করলেন, কী বেপার বলুন তো? হামার লেড়কাটাকে আপনারা লিয়ে চইলে গেলেন....

প্রিয়ব্রত বললো, আপনার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তবে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম।

—হাঁ, বিমারি তো হয়েই ছিল, তা আপনারা কেন লিয়ে গেলেন?

আমাদের একজনেরও তো ঐ একই বেমারি। সেইজন্য তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করাবার জন্য......

—এতো বড় আজীব বেমারি! সবুজ বাত্তি, সবুজ বাত্তি বলে চিল্লাতে থাকে, তারপর ব্যস্! আর নড়ে চড়ে না। এটা কী রে?

—ব্যাপারটা তো আমরাও বুঝতে পারছি না। তবে, আপনার ছেলেটাকে একটু সাবধানে রাখবেন। দেখবেন, যেন রাত্রে বের না হয়। আচ্ছা, আমরা এখন তাহলে চলি।

প্রিয়ব্রত আবার স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরালো।

বিমান বললো, আমরা একদিনের মধ্যে ফিরবো বলে এসেছিলুম, বাড়িতে নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে।

স্বপন বললো, আমার কিন্তু বেড়াতে খুব ভালো লাগছে। এদিকে আর দু' একটা জায়গা ঘুরে গেলে হয় না?

বিমান বললো, খুব মজা না? কলেজ খুলে গেছে।

প্রিয়ব্রত বললো, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে একবার গালুডি ঘুরে যাওয়া দরকার। চক্রধারীবাবু কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন, আমার খট্‌কা লাগছে।

বিমান বললো, না, প্রিয়দা, আর দেরি করা সম্ভব নয়। বাবা রাগ করবেন।

—তুই তা হলে এক কাজ কর্, বিমান। তুই আর স্বপন ফিরে যা. তোদের আমি ট্রেনে তুলে দিচ্ছি।

স্বপন বললো: কী বললে, প্রিয়দা? আমরা ফিরে যাবো?

—হ্যাঁ, সেটাই তো ভালো!

—এই কথাটা তুমি উচ্চারণ করতে পারলে?

—তোদের কলেজ খুলে গেছে, তোরা কলকাতায় ফিরে যা। আমি ব্যাপারটা আরও একটু ভালো করে দেখে যেতে চাই।

—তুমি একলা একলা এখানে মজা করবে, আর আমরা কলিকাতায় গিয়ে কলেজ করবো?

—এর মধ্যে আবার মজার কী আছে?

বিমান মুখ গোঁজ করে বসে আছে. সে আর কোন কথাই বলছে না। বোঝাই যায় সে রেগে গেছে খুব। হঠাৎ সে বলে উঠলো, চক্রধারীবাবুর বাড়ীতে গিয়ে কি লাভ হবে? উনি বলবেন, আমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই চলে এসেছি।

—তা বলে আমাদের কিছু না বলে চলে যাবেন?

—কতক্ষণ লাগে গালুডি যেতে?

—খুব বেশী দূর নয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবো।

—তাহলে আমরা সবাই মিলে সেখানে যাই। চক্রধারীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে আর কত সময় লাগবে? তারপর আমরা সবাই একসঙ্গে কলিকাতায় ফিরবো!

—কিন্তু যদি কোন কারণে দেরি হয়ে যায়? আমরা আরো অন্যদিকে চলে যাচ্ছি তো! হয়তো আজ রাতের মধ্যে কলকাতায় ফেরাই হবে না! সেইজন্যই বলছি, তোরা ট্রেনে চেপে ফিরে যা।

স্বপন বলে উঠলো, না, তা কিছুতেই হবে না।

প্রিয়ব্রত বললো, তাহলে এক কাজ করে দেওয়া যাক। আগে তোদের কারুর একজনের বাড়িতে একটা ট্রাঙ্ককল কিংবা টেলিগ্রাম পাঠানো যাক। দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে।

ঝাড়গ্রাম স্টেশনের কাছে আবার ফিরে আসা হলো। এবার পোস্ট অফিস থেকে কলকাতায় লাইন পাওয়া গেল। বিমানের বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বললো প্রিয়ব্রত। তারপর স্বপন আর বিমান যে ভালো আছে সে কথা বোঝাবার জন্য ওরাও টেলিফোনে কথা বললো একটু করে।

আর এক কাপ করে চা খেয়ে নিয়ে আবার ওরা ছুটলো গালুডির দিকে।

এর আগে ওরা স্টেশন থেকে খবর নিয়ে এসেছে যে ইতিমধ্যে একখানা ট্রেন গেছে গালুডির দিকে। তাছাড়া বাসেও যাওয়া যায় অবশ্য। অর্থাৎ চক্রধারী বাবুর এর মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবার কথা।

গালুডি পৌঁছে চক্রধারীবাবুর বাড়ি খুঁজে পেতে কোন অসুবিধেই হলো না। ছোট জায়গা, সবাই সবাইকে চেনে। তাছাড়া, চক্রধারীবাবুর যখন ট্রাকের ব্যবসা, তখন পেট্রোল পাম্পের লোকেরা চিনবেই।

জিপ গাড়িতে পেট্রল ভরে নেবার জন্য ওরা সেখানে ঢুকে পড়লেন। যে ছেলেটি পেট্রল দেয়, তাকে চক্রধারীবাবুর নাম বলতেই সে হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বললো, ঐ যে মাঠের ওপরে ছোট্ট সাদা কুঠিটা দেখছেন, ওটাই!

চক্রধারীবাবু যে-রকম নিজের বাড়ির বর্ণনা দিচ্ছিলেন, বাড়িটা সেই রকমই! সামনে একটা ছোট্ট বাগান, সেখানে অনেকগুলো পুরোনো লরি টরি পড়ে আছে।

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একজন বৃদ্ধ লোক বাড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কৌন ?

প্রিয়ব্রত বললো, চক্রধারী বাবু হ্যায় ?

বৃদ্ধ কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল ভেতরে। এরপর বেরিয়ে এলো একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে।

সে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কাকে চান? কোথা থেকে এসেছিল ?

প্রিয়ব্রত বললেন. আমরা আসছি ঝাড়গ্রাম থেকে একবার চক্রধারীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

প্রিয়ব্রত আশা করেছিল, এবার মেয়েটি বলবে, উনি তো ঝাড়গ্রামেই গেছেন।

কিংবা উনি তো ঝাড়গ্রাম থেকে এই মাত্র ফিরলেন।

কিন্তু মেয়েটি সে কথা বললো না, একটু অবাকও হলো না। সে বললো, উনি তো ঘুমোচ্ছেন।

ঘড়িতে বাজে সকাল সাড়ে এগারোটা। এসময় কোন মানুষের ঘুমোবার কথা নয়। চক্রধারীবাবু কি ঝাড়গ্রাম থেকে এসেই ঘুমিয়ে পড়লেন ?

প্রিয়ব্রত বললো, একটু বিশেষ দরকার আছে। ওনাকে একবার ডাকা যায় না ?

মেয়েটি বললো, দেখুন, উনি দু'দিন ধরে টানা এক টানা ঘুমোচ্ছেন।

বিমান বলে উঠলো, দুদিন ধরে ?

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রত তার হাত চেপে ধরে বললো, তাই নাকি? কেন, ওঁর কোন অসুখ করেছে ?

মেয়েটি বললো, তা তো বুঝতে পারছি না। কেন যেন দু'দিন ধরে ঘুমিয়ে চলেছেন।

—জাগাবার চেষ্টা করেন নি ?

—হ্যাঁ, ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন বটে, চোখ মেলে চাইছেন ও আবার ঘুমিয়ে পড়ছেন।

প্রিয়ব্রত দু'এক পা এগিয়ে গিয়ে বললো, আপনি চক্রধারীবাবুর মেয়ে নিশ্চয়ই ?

মেয়েটি ঘাড় হেলিয়ে বললো, হ্যাঁ। আপনারা জানলেন কী করে?

বিমান আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রত তাকে বাধা দিয়ে বললো, ওঁকে আমরা চিনি তো, ওঁর মুখ থেকে আপনার কথা শুনেছি। যদি কিছু মনে না করেন, আমরা একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি ?

মেয়েটি বললো, হ্যাঁ. আসুন না।

মেয়েটি ওদের নিয়ে গেল ভেতরের একটি ঘরে। পুরোনো আমলের একটা বড় খাটে শুয়ে আছেন চক্রধারীবাবু। সকালবেলা ওঁকে যে পোষাকে ঝাড়গ্রামে দেখা দিয়েছিল, অবিকল সেই পোষাক।

বিমান তীব্র দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকালো। মেয়েটি দারুন মিথ্যেবাদী তো। বলে কিনা দু'দিন ধরে একটানা ঘুমোচ্ছে। তাহলে সকালে দেখা হলো কার সঙ্গে ?

প্রিয়ব্রত এগিয়ে গিয়ে চক্রধারীবাবুর শিয়রের কাছে দাঁড়ালো।

বিমান আর স্বপন দরজার কাজে দাঁড়িয়েছিল, প্রিয়ব্রত হাতছানি দিয়ে বললো, স্বপন, তুই আমার কাছে আয় তো!

স্বপন আসতেই প্রিয়ব্রত ফিসফিস করে ডাকলো, চক্রধারীবাবু, ও চক্রধারীবাবু।

কোন সাড়া নেই।

দু' তিনবার ডেকেও যখন কোন ফল হলো না, তখন প্রিয়ব্রত ওঁর গায়ে হাত দিয়ে একটু ঠেললো। সঙ্গে সঙ্গে উনি চোখ মেললেন। মুখ ঘুরিয়ে প্রথম দেখলেন প্রিয়ব্রতকে। তারপর স্বপনের দিকে চোখ পড়তেই উনি আস্তে আস্তে উঠে বসলেন, তারপর দু'হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, সবুজ আলো! সবুজ আলো!

সে চিৎকার শুনে স্বপন পিছিয়ে গেল কয়েক পা, সে কিন্তু উত্তরে সবুজ আলো বলে চ্যাঁচালো না। বরং চক্রধারীবাবু স্বপনকে জড়িয়ে ধরবার জন্য ছুটে আসতেই স্বপন যেন খানিকটা ভয় পেয়েই দৌড় মারলো।

প্রিয়ব্রত চক্রধারীবাবুর হাত চেপে ধরে কড়া গলায় বললো, কোথায় যাচ্ছেন ? [ক্রমশঃ]

লালটুর বুদ্ধি

সুশীলকুমার চন্দ্র

ছোট্ট ছেলে, কতই বা বয়স, নাম লালটু। কিন্তু ছেলে হলে হবে কি? ওর দুষ্টুমির সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে বাড়ির বড়লোকেরা-ও' হিমসিম খেয়ে যাবার যোগাড়। একজন দুজন নয় লালটুর বাবা, মা, দাদু দিদা, দাদা, দিদি—সবাই আছে। কিন্তু অতজন লোককে হার মানতে হয় ওই ছোট্ট লালটুর কাছে।

অন্যে যতই হিমসিম খেয়ে যায় ততই লালটুর আনন্দ হয়। যেই দেখল দিদা স্নান সেরে পূজায় বসেছে অমনি নোংরা জামা পরে দিদাকে ছুঁয়ে দেয়। ব্যস্ত দিদা-ও' রেগে আগুন। আবার স্নান করতে হ'ল। ওদিকে বাবার অফিস যাবার সময় বাবার জুতোর জায়গায় মায়ের জুতোটা রেখে দিল। তাড়াতাড়ির মাথায় বাবাও ভুল ক'রে মায়ের জুতো পরেই অফিস গিয়ে হাজির। এঃ কি বিচ্ছিরী ব্যাপার!

কিন্তু সবচেয়ে দুষ্টুমি লালটু করে বসল দাদার ইতিহাসের বইয়ে রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর একটা এত্ত বড় গোঁফ এঁকে দিয়ে। শুধু কি তাই ওদিকে শিবজীও দুচোখে গগলস্ এঁটে বসল লালটুবাবুর অকৃপণ সহায়তায়। এর জন্যে সাজাও অবশ্য পেতে হল তাকে। প্রথমে দাদার কাছে, পরে অন্য সবাইয়ের কাছে।

কিন্তু এতে কি কিছু ফল হল? কিস্সু না। কারণ এই গোঁফ আর চশমাই ছিল লালটুর সবচেয়ে প্রিয়সঙ্গী। লালটু বাড়ির বারান্দা থেকে দ্যাখে ছোট বড় গোঁফ দিয়ে চোখে চশমা এঁটে কত লোক রাস্তা দিয়ে চলেছে। সকলের অজান্তে খবরের কাগজের হিন্দী সিনেমার নায়কের ছবিগুলো দ্যাখে—কি সুন্দর গোঁফ, কি সুন্দর চশমা। সেও মনস্থির ক'রে ফেলে বড় হলে সেও ঐ রকম চশমা পরবে, বড় গোঁফ রাখবেই তখন ত' আর কেউ বাধা দিতে পারবে না। এ বাড়িতে চশমা বলতে পরে শুধু ঐ দাদু। তাও কাঁচটা যা মোটা লুকিয়ে লুকিয়ে চোখে দেবার উপায় নেই, আর গোঁফ ত' কারুরই নেই। বাবা দাদু প্রত্যেকেই গোঁফ দাড়ি রাখা ত' দূরের কথা উল্টে রোজ গোঁফ দাড়ির ওপর ক্ষুর বুলিয়ে পরিষ্কার হয়ে নেয়।

অন্যদিনের মতো সেদিনও দুপুরবেলায় বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল লালটু। দুপুরবেলায় যেন কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। অথচ এঘরে দাদু দিদা আর ওঘরে মা কেমন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাবা অফিসে আর দাদা দিদি স্কুলে অর্থাৎ লালটু এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। যা খুশী তাই করতে পারে।

হঠাৎ সামনের দিকে চোখ পড়তেই লালটুর মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। লালটুদের বাড়ীর তলাতেই যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে কি সুন্দর দেখতে। যেমন লম্বা চওড়া চেহারা তেমনি মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। ওঃ! এর সঙ্গে যদি চোখে একটা চশমা থাকত তাহলে কি ভালই হতো। কিন্তু ওকি লোকটা চুপি চুপি হাতছানি দিয়ে লালটুকে ডাকছে। আবার একটা লাল বল দ্যাখাচ্ছে। দেবে নিশ্চয়ই। বাঃ! এই ত' সুযোগ এক সঙ্গে দু কাজ হবে। নতুন এক বুদ্ধি মাথায় এসে যায়।

চুপি চুপি দাদুর ঘরে ঢোকে লালটু। টুপ ক'রে ঘুমন্ত দাদুর বালিশের পাশ থেকে চশমাটা তুলে নিয়েই দরজা দিয়ে ভোঁ কাট্টা। পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে দরজার সামনে হাজির হয়।

ওদিকে লোকটিও তৎপর ছিল। লাল বলটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে লালটুকে কোলে তুলে নিয়ে দে দৌড়। তবে লালটু বোধহয় আরও তৎপর। চোখের নিমেষে দাদুর ঐ ভারী পাওয়ারের চশমাটা লোকটার চোখে এঁটে দিয়েই তার প্রিয় গোঁফ দাড়িগুলোকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে।

ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে তাজ্জব ব্যাপার। সব গোঁফ দাড়ি লোকটার মুখ থেকে খুলে লালটুর হাতে উঠে



দাড়িগুলোকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে।

আসে আর লোকটার অবস্থা ত' শোচনীয়। দাদুর ঐ মোটা কাঁচের চশমাটা চোখে পড়তেই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড যেন চোখের সামনে ঘুরতে থাকে। টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ে যায়।

এদিকে গন্ডগোলের শব্দে আশপাশের বাড়ী থেকে লোক বেরিয়ে পড়ে। ওদিকে বাড়ীতে আর এক কান্ড। হাতের কাছে চশমাটা না পেয়ে দাদু ত জল খেতে গিয়ে ভুল করে চিরেতার জল খেয়ে বসে, আর তেতোর চোটে হড়াক করে বমি করে বসে ঠাকুমার কাপড়ের ওপর। ঠাকুমা ত রেগে আগুন। মায়েরও ঘুম ভেঙে যায়। এদিকে অফিস থেকে বাবা আর স্কুল থেকে দাদা দিদিও ফিরে এসেছে সবাই গলির মুখে হাজির হয়ে লালটুর কীর্তি দেখে শুনে অবাক হয়ে যায়।

সবাই ত লোকটিকে ধরে টানতে টানতে থানায় গিয়ে হাজির হয়! থানার দারোগাবাবু যেন হাতের কাছে চাঁদ পেলেন। তিনি বললেন যে এ লোকটি এক কুখ্যাত গুন্ডা দলের পান্ডা। এদের কাজ ছোট ছোট্ট ছেলে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের শরীর থেকে রক্ত বের করে নিয়ে সেই রক্ত বিক্রি করা। এরপর দারোগা বাবু লালটুর কীর্তি শুনে অবাক হয়ে যান। লালটুর পিঠ চাপড়ে দারোগাবাবু বলেন সাবাস লালটুবাবু, এবার বল ত' তোমার কি পুরস্কার চাই?

দারোগাবাবুর পুরু গোঁফটা দেখিয়ে লালটু বলে "ঐটা।"

দারোগাবাবু এবার হো হো হেসে উঠে বলেন, 'এটা কিন্তু লালটুবাবু, একেবারে আসল গোঁফ। তোমার দাদুর ঐ চশমাটা চোখে এঁটে দিলেও এটা খোলা যাবে না।' দারোগাবাবুর শিশুসুলভউ স্তরে হাসির ঢেউয়ে এবার ঘরের পরিবেশটি মনোরম হয়ে ওঠে।

রেলগাড়ী

বাবলা ভট্টাচার্য্য

ঝিক ঝিক রেলগাড়ী
ছুটছেই ছুটছে।
তালে তালে গাড়ীটা
নেচে নেচে উঠছে।
ড্রাইভার ভাই সাব
মিটি মিটি হাসছে।
দার্জিলিং কালিংপং
নানা জায়গায় ঘুরছে।
কয়লার ধোঁয়াটা
এঁকে বেঁকে উড়ছে।
সূর্যের আলোটা
ক্রমে সরে যাচ্ছে।

অন্ধকারে গাড়িটা
গা ঢাকা দিচ্ছে।
দিন কাটে রাত কাটে
বছর বছর চলছে।
এইভাবে আমদানি
রপ্তানি হচ্ছে।
লাল আলো দেখলেই
রেলগাড়ী থামছে।
পুনরায় রেলগাড়ী
ঝিক ঝিক ছুটছে।

Postal Regn.No WB/EC-166 JHALMAL Feb.-March '81
N. P. Reg. No R N 32832/78 (FALGUN 1387)